উপন্যাসের উপকরণ

উপন্যাসের উপকরণ

শ্রীভোলা সেন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

একখানা বাঁধানো খাতা হাতের কাছে পেয়ে ভাবছি, কি লিখব। এ যেন তকতকে ঝকঝকে কুটীর তৈরি ক'রে সব দরজা খুলে রেখে চুপ ক'রে ব'সে আছি, পথিক যদি কেউ আসে!

অথচ ওর দুটোই সত্য। কোনটা কোনটার উপমা নয়।

ত্রিশ বৎসর ধ'রে দেশ-দেশান্তর ঘুরে শেষ জীবনে বাংলার এক না-বড় না-ছোট শহরে ঠিক সেই রকমেরই একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছি। উদ্দেশ্য, দেশের মাটির ধূলোয় দেহের ছাই উড়িয়ে দেওয়া।

দীর্ঘকালের ভবঘুরেরা কেমন যেন এক অদ্ভুত জীবে পরিণত হয়। আমি নিজে গিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করি নি। কয়েকমাস হ'ল এই শহরে এসেছি, আমার পরিচয়ও কেউ জানতে চায় নি। লোক-পরিচয়ের ক্ষেত্রে গ্রাম এবং শহরে এইখানেই তফাত।

কিন্তু খাতাখানা শূন্য প'ড়ে রইল, ঘরখানিও তাই। লেখাও আসে না, অতিথিও না। বোধ হয় বৃদ্ধের সংসর্গ ওরা পছন্দ করে না।

অগত্যা পুরাতন লেখার দপ্তর খুলে বসি। বড় আশ্চর্য হই লেখাগুলো প'ড়ে। মনে হয়, কে যেন জোর ক'রে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল। কতক হারিয়ে গেছে, কতক পোকায় কেটেছে। যে কটা বাকি ছিল, ঝেড়ে মুছে নকল ক'রে আজ বহুকাল পরে তাদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিলাম। ভাগ্যপরীক্ষারও, আমার নয়, লেখাগুলোর।

ছোট্ট বাংলো-প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে একটু ফুলের বাগান, আমার নিজস্ব সৃষ্টি। কাব্যলেখা ও ফুলের চাষ, আমার মনে এই দুইয়ের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই।

ওমর কহে, আমার বাণী
জগৎকে আজ শুনিয়ে দিয়ো—
রক্তগোলাপ রঙিন সুরা
আমার কাছে সমান প্রিয়।

শেষ পর্যন্ত রঙিন সুরার চেয়ে রক্তগোলাপ বেশি কাজে লাগল। অল্প দিনের মধ্যেই সুরার বোতল নিঃশেষ হয়ে গেল, পচানো মদ, নেশাও ভাল জ'মে উঠল না। অর্থাৎ, রচনার পুরাতন সঞ্চয় ফুরিয়ে গেল, নূতন সৃষ্টি সম্ভব হ'ল না। কেমন ক'রে হবে? মদ-চোঁয়ানো যন্ত্রটাই গেছে বিকল হয়ে।

চির-উর্বর ওই রক্তগোলাপের ক্ষেত্র। মাতা পৃথিবীর অফুরন্ত দাক্ষিণ্য মৃদু জলসিঞ্চনেই আত্মপ্রকাশ করে। আমার ছোট ফুলের বাগানে যে কটি গাছ বুনেছিলাম, সবগুলি তার বেঁচে নেই সত্য, বাঁচবেও না, তবু আমার ইচ্ছামত নূতন নতন বুনতে পারি।

স্পষ্ট বুঝতে পারি, প্রথম জীবনে লেখা গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতির মূল উৎস কোথায়! জলসিঞ্চন। আমার স্নেহ-বঞ্চিত শুষ্ক হৃদয়ে আজ তারা জাগবে কেন, বাঁচবে কেন? জলসিঞ্চনের একান্ত অভাব।

সুরার অভাবে রক্তগোলাপ কাজে লাগতে পারে, কিন্তু রক্তগোলাপ না থাকলে রঙিন সুরার কোনও সার্থকতাই নেই। রঙিন চোখে দেখব কি? গোলাপ বরং বিনা নেশাতেই আমার চোখে রঙের ঘোর লাগিয়ে দিতে পারে।

বাস্তবিক, হ'লও তাই। আমাকে এই কাব্য-সংকট থেকে উদ্ধার করলে, গোলাপ নয়, গাঁদা। এই কয় মাসে আমার বাগানের চারিপাশে ফুটেছিল প্রচুর গাঁদাফুল, জায়গাটাকে আলো ক'রে

রেখেছিল। গোলাপের চাষ অত সহজ নয়। গরিবের ঘরে কি রাজরাণী আসে?

না আসুক, আমার গাঁদাই ভাল। ওর প্রাচুর্যে আমার মন ভ'রে যায়। কোন্‌টা ভাল? বিরল উৎকর্ষ, না, সহজ প্রাচুর্য? কথাটা আজও আমি ভেবে ঠিক করতে পারি নি।

সেদিন সকালে বাগানে ব'সে আছি। রাস্তার দিকে পিঠ ক'রে ছোট্ট ক্যাম্প-চেয়ারে ব'সে ব'সে চুরুট টানছি। শীতের রৌদ্র বাগানে প'ড়ে গাঁদাফুলের রঙে মিশিয়ে গিয়ে সোনালী আভা ধারণ করেছিল। একদৃষ্টে গোলাপগাছটার পানে চেয়ে আছি, না, ওটা বাঁচবে না।

দাদু!

ডাক শুনে চমক লাগল। পিছন ফিরে দেখি, একটি সাত বছরের ছেলে। আট বছরও হতে পারে।

কি চাও?

আজ সরস্বতী-পূজো। গোটা কতক ফুল দেবে? গ্যাঁদা ফুল? তোমার তো অনেক ফুটেছে, দাও না দুটো?

সপ্রতিভ বালক। মা-সরস্বতীর দূত। আমার কাব্য-চর্চায় কাজে লাগতে পারে। অভ্যর্থনা ক'রে বাগানে ঢুকিয়ে তার ক্ষুদ্র অঞ্জলি ভ'রে প্রার্থিত ফুল তুলে দিলাম। বড় বড় চোখ মেলে সে আমার মুখের দিকে চাইল, চোখে চোখ পড়তেই ছুটে পালিয়ে গেল।

তোমার নাম কি খোকা?—তার ছোট্ট মুঠোয় ফুল দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলেছিল, বিশ্বনাথ।

বিশ্ব-বালক! মাথায় টাক আর সাদা চুল দাড়ি থাকলেই যেকোনও

ব্যক্তি দাদু হয়ে যেতে পারে। অবশ্য, গাঁদাফুল-সংগ্রহের গরজটাই ছিল মূলে।

একটু পরেই টের পেলাম, আমার ব্যবসায়-বুদ্ধির একান্ত অভাব। তার কাছে খবর পেয়ে মা-সরস্বতীর সৈন্যদল আমাকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করলে। ঐ বয়সের এবং একটু ছোট-বড় এক দল ছেলেমেয়ে। ভাগ্যে ফোটা ফুল যথেষ্ট ছিল এবং ওদের হাতের মুঠিগুলি ছিল ছোট ছোট!

ফুল সংগ্রহের কৌশলটাও শিখে এসেছিল, বললে, দাদু ভারি ভাল লোক।

ছেলেরা গদ্য-কবিতা, মেয়েরা পদ্য।

কিছু পরে সাহস পেয়ে এল আর এক দল ছেলেমেয়ে, বয়সে কিছু বড়, কিশোর-কিশোরী বলা যেতে পারে। ফুলের লোভেই আসা, কিন্তু বড় চঞ্চল, মতিগতির স্থিরতা নেই। ফুল তুলে কেউবা দুটো খোঁপায় গুঁজলে, কেউ বা পকেটে। ব্যাপারটাতে বেশিক্ষণ মন বসল না, বাগান ছেড়ে সটান আমার বসবার ঘরে ঢুকে পড়ল। অগত্যা আমাকেও তাদের পিছু পিছু আসতে হ'ল।

কলকণ্ঠে অনর্গল অসংলগ্ন ব'কে যায়, অপর পক্ষকে কথা কইবার সুযোগ দেয় না।

ওটা কি বই? সংস্কৃত বুঝি? আপনি পড়েন?

এই যে! বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীও রয়েছে দেখছি! আমাদের ইস্কুলে 'আনন্দ মঠ' পড়ানো হয়।

লাল রঙের বাঁধানো খাতাটা কিসের? (খাতাখানা খুলে ফেলে) বাঃ, এ যে দেখছি কবিতা! আপনি লেখেন?

খোলা পাতাটা থেকে দুটো লাইন প'ড়ে ফেললে—

পাপ-পথে ধন কর অর্জন
যাদের লাগি—
হবে কি তাহারা তোমার পাপের
অংশভাগী ?

বেশ তো! রত্নাকর দস্যুর গল্প আমাদের বইয়েও আছে, তবে সেটা গদ্য।

ছেলেটা অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান—এ কথাটা মনে মনে স্বীকার করতেই হ'ল।

এই রকম চলতে থাকে এবং আরও চলত। কিন্তু ক্রমেই তারা গম্ভীর হয়ে উঠল। বাস্তবিক, কতই বা বকতে পারা যায়! হয়তো বা বাড়ির শাসন মনে পড়েছে। ক্ষিধেও পেয়ে থাকবে। ধীরে ধীরে তারা বিদায় নিলে।

ছোটগল্পের দল! কতক রিয়ালিস্টিক, কতক রোমান্টিক। ফুল নিতে আসা শুধু নয়, নূতন মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহলও অপরিসীম।

যাবার সময় তাদের একজন ব'লে গেল, ঠাকুমা আপনার কথা বলছিলেন। বলছিলেন, ভদ্রলোক কতদিন হ'ল এসেছেন, খোঁজ-খবর নেওয়া হয় নি। আজ আসবেন।

বিধাতার দান। চাইলে পাওয়া যায় না, না চাইতে অনেক আসে। বুঝলাম, এরা নিকট প্রতিবেশী। বহু দিন পরে কর্তব্যবোধ জেগে উঠেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে একটা মাসিক পত্রিকার পাতা উলটিয়ে পড়বার চেষ্টা করতেই দ্বারে করাঘাত। দুয়ার খুলে দেখি, সম্মুখে এক স্থূলাঙ্গী বর্ষীয়সী মহিলা, চোখে সোনার চশমা, পায়ে চটি, সর্বাঙ্গ ভারী ভারী গহনার ভারে আক্রান্ত। আমি যখন দেশ ছেড়ে

চ'লে যাই, বাঙালী মহিলার এই রূপ অন্তত আমার নজরে পড়ে নি।

মনে মনে তিরিশ বছর পিছিয়ে গিয়ে সাহস ক'রে বললাম, আসুন দিদি, বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

বসলেন না। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যা ক'রে গেলেন, তাতে যে কোনও ঠাণ্ডা মাথা গরম হয়ে উঠতে পারে।

প্রথমেই আমার পরিচয় ও খোঁজখবর নিলেন। যেটুকু শোনানো সম্ভব শুনলেন, এবং তাতেই তাঁর স্নেহ-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ক্ষুদ্র 'দিদি' ডাকের ফল। এতদিন আসতে পারেন নি ব'লে অনুতপ্ত হলেন, সময়াভাব। কিন্তু আজ কেমন ক'রে সময় পেলেন, তার কৈফিয়ৎ দিতে ভুললেন।

বললেন, তুমি বড় ছেলেমেয়ে ভালবাস ভাই। পণ্টু বললে—ও-বাড়ির দাদু ফুল দিয়েছে। একদিনেই দাদু। ভালবাসা বুঝতে ওদের একটুও সময় লাগে না। চিনু বললে—একদিন সে বাগানে ঢুকে ফুল তুলেছিল, দেখেও তাকে তুমি কিছুই বল নি। তুমি নাকি রামায়ণ লিখছ? একদিন এসে শুনব।

চিনু কবে বাগানে ঢুকেছিল, আমি দেখিও নি, মনেও নেই। এই সব প্রথম দর্শনেই 'দিদি'-সম্বোধনের প্রতিদান। আমার প্রতি একেবারে 'তুমি' সম্বোধনও তাই।

রামায়ণ লেখবার স্পর্ধা আমার কোনও কালেই ছিল না, আজও নেই। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে আখ্যায়িকা নিয়ে 'কথা ও কাহিনী'র অনুকরণে কয়েকটা কবিতা লিখেছিলাম। বুঝলাম, সেই অতি-বুদ্ধিমান ছেলেটার এই অপপ্রচার, এত সত্বর এবং মর্মঘাতী।

তারপর শুরু হ'ল নিজের কথা। কর্তা ওকালতি করেন। সংসার-

বিষয়ে তিনি উদাসীন। চুটিয়ে রোজগার ক'রে চলেছেন। সংসারের সব খুঁটিনাটি আমাকেই দেখতে হয়, এমন কি, ভদ্রতা রক্ষা পর্যন্ত। নিজের অম্বলের অসুখ, বধূদের কর্তব্যজ্ঞানহীনতা, তারা আজকালকার মেয়ে—জানেই বা কি আর বোঝেই বা কি, ঝি-চাকরের অসুবিধা, দুধ মাছ কোথায় সস্তা, কলকাতা ভাল, না পাড়া-গাঁ ভাল, এই সব এবং আরও কত কি! পণ্টু-চিনু তাঁর নাতি-নাতনী, ছোট বড় আরও কতকগুলি আছে।

শুধু প্রশংসা করলেন তার, যে বউটি গত বৎসর মারা গেছে। চোখের জলও ফেললেন একটু। ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছেন, তাও বললেন। ছেলেদের বিষয়ে মন্তব্য করলেন, আহা, ওরা কাজকর্ম নিয়ে থাকে।

টেবিলের উপর মাথা রেখে, মাথার রগ টিপে ধ'রে শুনতে বাধ্য হই। কিন্তু তিনি আমার প্রতি গোড়া থেকেই স্নেহশীলা। আমার নিদ্রালু ভাব দেখে বললেন, আজ তবে আসি ভাই। এবং যাবার সময় জানিয়ে গেলেন, আমার কোনও অসুবিধা হ'লে নিঃসংকোচে যেন তাঁকে জানানো হয়।

এ যেন ফেনিয়ে ফেনিয়ে টেনে টেনে লেখা একখানা বৃহদাকার উপন্যাস।

বলা বাহুল্য, রাত্রে কোনও ঘটনা ঘটে নি। সারাদিনের উপদ্রবে ও উত্তেজনায় ঘুমটাও ভাল হয়েছিল।

উপদ্রব? কখনই না। এই তো আমি চেয়েছিলাম। বরং এদের আনাগোনায় দিন কাটছে ভাল। উকিলবাবু নিজেও একদিন এসেছিলেন। বাস্তবিক, কর্মনিমগ্ন জীবন তাঁর। আমিও মাঝে মাঝে কারও কারও বাড়ি যাই, ছেলেমেয়েরা ধ'রে নিয়ে যায়। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনার ভক্ত পাঠকের দলও গ'ড়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে।

হতে পারে। আমার দ্বারা সাহিত্য-সৃষ্টি এখনও সম্ভব। শিশু-সাহিত্য, কবিতা, ছোটগল্প। এমন কি, ঐ উকিল-গিন্নীর বিশাল সংসার অবলম্বনে বিরাট একটা উপন্যাসও হয়তো লিখতে পারি। মনে হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের মৃদু বর্ষণের পর উকিল-গিন্নীর হলকর্ষণ আমার মনঃক্ষেত্রকে যেন কতকটা উর্বর ক'রে তুলেছে।

সেই অব্যবহৃত বাঁধানো খাতাটা খুলে সেদিন সকালবেলায় কিছু একটা লেখবার সঙ্কল্প ক'রে টেবিলের সামনে ব'সে ব'সে ভাবছি। দরজা খোলাই ছিল। সহসা জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দে চমকিত হয়ে দরজার দিকে চেয়ে দেখি, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে! আগন্তুক দৃষ্টিগোচর না হ'লেও তার অস্তিত্ব অনুভব করি। উঠতে যাব, এমন সময় মধুর কণ্ঠে বাইরে থেকে প্রশ্ন এল, মে আই কাম ইন?

টেবিলের বাঁ পাশে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। প্রচ্ছদপটে ছিল তাঁরই ছবি। ইংরেজী কথাটা আমার কর্ণে ধ্বনিত হ'ল—পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? রক্তকরবীর কবি বলেছেন, পাখির কূজন বৃদ্ধ বটবৃক্ষের প্রাণে পুলক জাগিয়েছিল।

মে আই কাম ইন? ভারি সুন্দর কথাটি। মানুষের ঘরে মানুষ আসতে চায়, মানুষের মনে ঢুকতে চায় মানুষের মন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসতে পার, দরজা তো খোলাই আছে। একটা পর্দাও টাঙানো নেই।

তরুণী। একেবারে মডার্ন। ছোট একটি নমস্কারের পর নতচক্ষে দাঁড়িয়ে রইল। বসতে বলি, এবং সে চোখ নামিয়েই ব'সে থাকে।

বাঙালীর মেয়ে। অনেক কিছু পালটে গেছে। কিন্তু ঐ নত-চক্ষুতে আজও তারা ধরা প'ড়ে যায়।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে সে বললে, সে কয়েকটি কবিতা

লিখেছে, দু-একটা আমাকে শোনাতে চায়। এই ব'লে, সসংকোচে তার আঁচলের ভিতর থেকে একটি ছোট বাঁধানো খাতা বের করলে।

আমার হাতে কোনও কাজ নেই, কাছে কোনও সঙ্গী নেই, আর পিছনে কিছু পিছটানও নেই। ব'সে ব'সে হাঁপিয়ে উঠেছি। সময় কাটানোর সুবিধার জন্য কৃতজ্ঞহৃদয়ে কবিতা শুনতে প্রস্তুত হয়ে বসি।

কম্পিত কণ্ঠে মেয়েটি পড়লে—

জনাকীর্ণ বিশাল পৃথিবীর
পথের ধারে বাঁধব আমি বাসা,
ঠিক যেন সে বিহঙ্গমের নীড়,
পথিকেরা করবে যাওয়া-আসা।
মোর আঙিনায় বসবে তারা সবে,
দান-প্রতিদান চলবে পরস্পর,
মুখর হবে মিলন-মহোৎসবে
মধুর হবে পথের ধারের ঘর।

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তাদের মধ্যে যদি চোর থাকে কেউ?

সাহস পেয়ে সে পরিষ্কার গলায় আবৃত্তি করলে—

হোক না তারা সাধু কিংবা চোর,
হোক না তারা মন্দ এবং ভালো,
পথের ধারের ঘরখানিতে মোর
মিলবে এসে আঁধার এবং আলো;
কেউ বা তাদের পাত্রে ঢালি সুরা
গাইবে ব'সে হতাশ-প্রেমের গান,
অপর কেহ বাজিয়ে তানপুরা
সুরের আলোয় করবে উজল প্রাণ।

মেয়েটার সাহস তো কম নয়! চোরও ঢুকবে, মাতালও ঢুকবে। আমি তো চমকে উঠলাম। তবে এই ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে, এ তার কবিতা ছাড়া কিছুই নয়, ও সত্যিকার কিছু করতে যাচ্ছে না ও-রকম।

আরও প'ড়ে যেতে লাগল।

কবিতাটি দীর্ঘ। তবু সবটা তুলে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল না, কারণ পরে ছাপার অক্ষরে আমার হাতে এসেছিল। কিন্তু তা হ'লে আমার কথা বলা হয় না।

আমি বললাম, যতটুকু আমি শুনলাম, খুব ভাল লেগেছে।

প্রশংসা শুনতেই আশা, কিন্তু আমার কথা শুনে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। অবশ্য সেটা স্থায়ী নয়। বেশ বুঝতে পারা গেল যে, অল্পক্ষণের আলাপেই আমার সম্বন্ধে সব সঙ্কোচ সে কাটিয়ে উঠেছে। এটা সেই লজ্জা, যা আত্ম-প্রশংসা শুনে পুরুষ এবং নারী, যাদের ভদ্র তরুণ মন, সমানভাবেই পায়।

হঠাৎ মেয়েটি আমাকে প্রণাম ক'রে উঠে বললে, আপনাকে আমি কি ব'লে ডাকব?

বাঙালীর মেয়ে। মাত্র এক ঘণ্টার আলাপে ও আমাকে একটা কিছু ব'লে ডাকতে চায়।

বললাম, আজকের কাজ তো চুকে গেল, সে এর পর স্থির করা যাবে। কিন্তু আবার এসো।

ভয়ে ভয়ে সে ব'লে ফেললে, না, এবার আপনার পালা। এই ব'লে চক্ষের পলকে নৃত্যচপল গতিতে অন্তর্হিত হ'ল।

ছিপছিপে একহারা চেহারা—যেমনটি দেখে সংস্কৃত কবিরা 'দেহলতা' শব্দটা আবিষ্কার করেছিলেন; গায়ের রঙ নবমীর জ্যোৎস্নার মত। চোখের পাতার নীচে স্নিগ্ধ ছায়া, নবমীর জ্যোৎস্না সেখানে পূর্ণ প্রভাব

বিস্তার করতে পারে নি, যেমন জ্যোৎস্না-রাতে তরুলতায় ঘেরা দীঘির কালো জল। হাসিটি মিষ্ট এবং উজ্জ্বল, নবমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ-মিশালি জ্যোৎস্না তাতে লীলা ক'রে বেড়ায়। কণ্ঠস্বর কোকিলের মত নয়, কোকিল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটায়,—এতখানি কবিতা প'ড়ে গেল, কিন্তু উচ্চারণে ছন্দোলালিত্য একটুও বিকৃত হ'ল না। স্থির ধীর —ছিল শুধু মৃদুকম্পন। যে কম্পনে বীণার তার রণরণিয়ে ওঠে।

আমার এই বর্ণনা অত্যুক্তি হতে পারে—বজ্রাঘাতে অর্ধদগ্ধ বৃদ্ধ নিঃসঙ্গ বটবৃক্ষ পাখির কূজনকে এমনই ক'রেই বড় ক'রে দেখে।

এমনই চঞ্চল যে, নিমন্ত্রণ ক'রে গেল, কিন্তু ব'লে গেল না তার নাম-ঠিকানা।

কিন্তু চোখ বুজে ব'সে ভাবতে গেলে মনে পড়ে, একটি স্থিরমূর্তি, একখানি অচঞ্চল ছবি।

এ যেন উচ্চভাবের লঘুনাটিকা একখানা।

কিন্তু তার ঠিকানা কোথায় পাব? শহরটি তো নিতান্ত ছোট নয়?

২

মনে ভাবলাম, এই মেয়েটিকে কেন্দ্র ক'রে একখানা নাটকের প্লট গ'ড়ে তুলতে হবে। কিন্তু তা হয়ে উঠছে না। প্লট জমে তো ভাষা জমে না, ভাষা জোটে তো প্লট যায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ও-পথ ছেড়ে দিলাম।

আর একটা মস্ত বাধা, এই ধরনের মেয়েদের আমি মোটেই চিনি না। কবিতা শোনার অল্প-পরিচয়ের ওপর নির্ভর ক'রে যে নাটক বা উপন্যাস সৃষ্ট হবে, তা হবে নিতান্ত কাল্পনিক, একান্ত অবাস্তব। ওসব যৌবনে

অনেক লিখেছিলাম, এই বয়সে উৎসাহ জাগে না। পোকায় খেয়েছে, ভালই করেছে ; হারিয়ে গেছে, বেশ হয়েছে।

বার্ধক্যের শ্রেষ্ঠ অবদান—মেয়েদের সংকোচহীন ব্যবহার। ভাবহীন শুষ্ক ঘোলাটে দৃষ্টিতে ওরা অবিশ্বাসের কিছু দেখতে পায় না। অল্প-পরিচয়েই এই অপরিচিতা যেভাবে অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে উঠেছিল, একটু বেশি মেলামেশার ফলে, ধীরে ধীরে আমি তার মনের ভাষা পড়বার সুযোগ পেতাম। শিক্ষিতা তরুণী—কবিতা লেখে, পথের ধারের ঘরখানিতে তার অতিথি-সমাগমের সাহস রাখে—একখানা উপন্যাস, অন্তত একটা মনস্তাত্ত্বিক গল্পের উপাদান জুটতই। হায়, আমি হেলায় হরিয়েছি, গরজ ক'রে তার ঠিকানাটা জেনে রাখি নি।

এই সব অনাবশ্যক দুর্ভাবনায় মন ও মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত, এমন সময় এক গুরুতর দুর্ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়ি। এই পাড়ারই পারিবারিক ব্যাপার, বিবাহ-ঘটিত।

ছেলের মা ও মেয়ের মা উভয়েই পতিহীনা। প্রায় নিঃসম্বল। এরূপ ক্ষেত্রে পাঁচজনের সাহায্য ও সহানুভূতি ছাড়া কার্য-নির্বাহ এক রকম অসম্ভব। অর্থ, পরামর্শ ও পরিশ্রম দিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমি নিজেও এই ব্যাপারে যথাসাধ্য করতে ত্রুটি করি নি। সামাজিক ক্রিয়া—পরস্পরকে নিয়েই তো সমাজ, না করলে চলবে কেন ?

উভয় পক্ষই আমাকে বিয়ের পদ্য-লিখতে অনুরোধ করে। তাদের সেই অনুরোধও আমি সাধ্যমত রক্ষা করি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আর একবার আমি আমার বিষয়বুদ্ধির নিদারুণ অভাবের পরিচয় দিলাম উভয় পক্ষের ওকালতি করতে গিয়ে। হায়, কে জানত তখন যে, পরে এই উভয় পক্ষ দুই বিরুদ্ধ পক্ষে পরিণত হবে ?

শুভকার্য আমার বাড়িতেই সম্পন্ন হ'ল—এবং নির্বিঘ্নে। তাদের

নিজের বাড়িতে স্থানাভাব। বিবাহের রাত্রিতে কোনও গোলমালই হয় নি। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ ভুরি-ভোজনে তুষ্ট হয়ে যে যার ঘরে চ'লে গেল —ভুরিভোজন আমারই অর্থব্যয়ে। মেয়ের মা, ছেলের মা তারা দুজনও একটু বেশি রাত্রে বিদায় নিতে বাধ্য হ'ল। আমার শয়নকক্ষে লোহার বাসর-ঘরে বর-কনে শুয়ে রইল।

সকালবেলায় বাসি-বিয়ে। এতেও কিছু খরচপত্র হ'ল—অবশ্য আমারই পকেট থেকে। গোড়া থেকেই ছোটখাটো বিঘ্ন, মানে—বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে খুঁটিনাটি ঝগড়াঝাঁটির উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু আমি নিজে মধ্যস্থতা ক'রে অতি কষ্টে অঙ্কুরেই তাদের বিনাশ ঘটিয়েছিলাম।

এইবার মেয়ের শ্বশুর-বাড়ি যাওয়ার পালা। ছেলের মা ছেলে-বউ নিয়ে শুভক্ষণে যাত্রা করল। উলু পড়ল, শাঁখ বাজল। বাঁচা গেল, এ যেন আমারই দায় হয়ে উঠেছিল! এত ঝঞ্ঝাট জানলে, এই সব পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতাম না। কেমন ক'রে জানব? আমি তো কখনও ছেলেমেয়ের বিয়ে দিই নি। আজীবন ভবঘুরে।

আপনারা ভাবছেন, ছেলের মা বিয়ে দিতে এল, এ কি রকম কথা? গাঁয়ে ঘরে নিজেদের মধ্যে বিয়ে, ও-রকম হয়ে থাকে। তা ছাড়া মনে রাখবেন, আহা, বর-ক'নে দুজনেই পিতৃহীন।

মেয়ের মা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, এমন দিনে কাঁদতে নেই। কাঁদবেই যদি, মেয়ের মা হতে গেলে কেন?

আমার যে ছেলে ছিল না, একটিও না। বাবাকে এত ক'রে বললাম, তা তিনি তাঁর নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত।

বাস্তবিক, উপায় ছিল না, বাধ্য হয়েই তাকে মেয়ের মা হতে হয়েছে। বললাম, আমার তো কাজ নেই, এর ব্যবস্থা আমিই করব। তুমি দুঃখ ক'রো না।

বাবার ওপর অভিমান তার ঘুচল না, মুখ ভার ক'রে বাড়ি চ'লে গেল।

পরদিন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড, আমার বাড়িতেই। পত্ত দুটো নিয়ে। ছাপা হয় নি, হাতে-লেখা কবিতা আমিই বিবাহ বাসরে 'সমাগত ভদ্রমণ্ডলী'কে প'ড়ে শুনিয়েছিলাম। ছেলের মা বলে, আমারটা ভাল; মেয়ের মা বলে, আমারটা।

আমার কাছে তারা বিচার চায়। আচ্ছা, বলুন তো, আমারই লেখা দুটো কবিতা, কেমন ক'রে বলি, কোন্‌টা ভাল? এমন বিপদেও মানুষে পড়ে?

মেয়ের মা রেগে বললে, দে, আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে। আমি বিয়ে ভেঙে দিলাম।

দুদিনেই বিবাহভঙ্গ, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

ইস! দেবে! দিলেই হ'ল! তোর মেয়ে ত আমার হাতের মুঠোয়। লোহায় ঠুকে তার মাথা ভেঙে দেব। দেখবি?

বিপদ বুঝে, তাড়াতাড়ি উঠে তার হাতের মুঠো থেকে বর-কনে দুটোকেই কেড়ে নিয়ে, লোহার বাসর-ঘরে পুরে, তালাচাবি লাগিয়ে দিলাম। লোহার বাসর-ঘর, একটা পুরাতন টিনের বাক্স।

পরে ক্রন্দন, চীৎকার ও গর্জন। ক্রমে ক্লান্তি। অগ্নিদৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাইতে চাইতে তারা বেরিয়ে যায়।

পরে শুনলাম, ব্যাপারটা তাদের স্কুলের পণ্ডিতের কাছ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বলেছিলেন, দুটোই ভাল। বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য অভিভাবকরাও তাই বলেছিলেন।

ফলে, এই ব্যাপারে আমার কবিযশ পাড়ায় এবং পাড়া ছাড়িয়েও ছড়িয়ে পড়ল। এমন কি, স্থানীয় হাই স্কুলের হেডমাস্টারের বিদায় উপলক্ষ্যে 'শোকোচ্ছ্বাস' আমাকেই লিখতে হয়েছিল।

বহু পরে একদিন দেখি মেয়ে দুটো (ছেলের মা ও মেয়ের মা) গলাগলি গান গাইতে গাইতে মাঠের দিকে চলেছে। আমার বাড়িতে এলে দেখতে পাবেন, নির্বিকার বর-কনে আজও সেই টিনের বাক্সের ভিতর পাশাপাশি শুয়ে আছে।

৩

এত বড় একটা উৎসব ও তজ্জনিত বিবাদ-বিসম্বাদের পর অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। আমার শিশু-সাহিত্যের উপকরণগুলি আসে, যায়, খেলা করে, ঝগড়া করে, হাসে এবং কাঁদেও মাঝে মাঝে—ঝগড়ায় হেরে গিয়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য কিছুই হয়ে ওঠে নি।

আপনারা বলবেন, ওদের আমি যে-ভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছি, তাতে সাহিত্য তো দূরের কথা, সংসারের কোনও কাজই আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। কথাটা বড় মিথ্যে নয়। কিন্তু বিবেচনা করুন, ওদেরই যদি তাড়িয়ে দেব, ওদের নিয়ে সাহিত্য হবে কেমন ক'রে?

মনে পড়ে, একদা তরুণ-জীবনে ছুটির দিন নির্জনে ব'সে কবিতা লিখছিলাম। তার দুটি ছাত্র আজও আমার মনে আছে—

মানব-কাননে ঘুরিয়া মরিব, মনের কুসুম যতনে তুলি,
গাঁথিয়া তাহাতে পীরিতির হার, পরিব গলায় আপন ভুলি!

দ্বারে করাঘাত। বাইরে থেকে চিৎকার ক'রে বন্ধু ডাকলে, কই হে, বেরিয়ে এস, কোলাকুলিটা সেরে ফেলি।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে খিল খুলে দিলাম। নমস্কার ও আলিঙ্গনের পর বন্ধু বললে, বেশ লোক তো! আজকের দিনে ঘাড় গুঁজে ব'সে কবিতা লিখছ? তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সেদিনটা ছিল বিজয়াদশমীর পরদিন। বন্ধুর সস্নেহ তিরস্কারে আমার নিজের 'মনের কুসুমে' কেমন যেন দোলা লাগল। কবিতার উপর বিরক্ত হয়ে বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। কবিতাটা কোনও দিনই শেষ হয় নি। আবার এমনও হয়েছে, আমোদ-প্রমোদের মধ্যে, বন্ধুর মুখে এক অবর্ণনীয় বিচিত্র হাসি দেখে, হাসির কবিতা লেখবার জন্য হাত সুড়সুড় ক'রে উঠল, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বন্ধুর সঙ্গ পরিহার করি। এইভাবে অসমাপ্ত কবিতা ও অসম্পূর্ণ বন্ধুত্বে যৌবন আমার ভ'রে উঠেছিল।

কবি হতে পারতাম নিশ্চয়। কিন্তু এই উভয়-সংকটে প'ড়ে হয়ে উঠল না। তা না হোক। অসমাপ্ত কবিতার জন্য দুঃখ করি না মোটেই, কিন্তু অসম্পূর্ণ বন্ধুত্বের জন্য আজও আমার মন কাঁদে।

একটা বিষয়ে আপনারা বড় ভুল করছেন। আমার এই বৃদ্ধ-বয়সের ছোট ছোট বন্ধুগুলি সংসারের সকল কাজ এক মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড ক'রে দিতে পারে সত্য ; এমন কি, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে অর্থাৎ ৩৮ অক্ষরেখায় দলে দলে যদি লাইন বেঁধে দাঁড়ায়, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এত বড় একটা ইণ্টারেস্টিং ঘোড়দৌড় বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু কবিতা লেখার অন্তরায় ওরা একেবারেই নয়। পাখির কল-কাকলিতে ধ্যানভঙ্গ হয়, সে কেমন কবি ?

তা নয়। শিশু-কাব্যের আসর মনে মনে বেশ একটু জমিয়ে তুলেছিলাম, কিন্তু অন্য দিকে কোথায় যেন ফাঁক পড়েছে। চুপ ক'রে ব'সে ভাবছি। হঠাৎ দেখে চমকে উঠি, বৃদ্ধ বটবৃক্ষের ঠিক বুকের কাছে, ছোট একটি সবুজ ডালে কবিতার খড়কুটো দিয়ে ক্ষুদ্র নীড় রচনা ক'রে অচিন্ পাখি উড়ে চ'লে গেছে। 'পথের ধারের ঘর' !

ভারি খারাপ বোধ হ'ল। আবার জড়িয়ে পড়া ! আমার ছোট

বন্ধুরা উদাসীন—জড়াজড়ির ধার ধারে না। কিন্তু এই ব্যাপারটা যতই ভাবি, ততই অস্বস্তিতে আমার মন ভ'রে ওঠে।

খড়কুটো দিয়ে তৈরি পাখির বাসা, কতটুকুই বা ভারী—একটু ঝড়েই ঝ'রে পড়বে। অমন কত পাখিই তো বাসা বেঁধেছিল, বাবুইয়ের শক্ত বাসাও টিকতে পারে নি। কিন্তু ঝড় তো নিত্য আসে না, আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। কবে আসবে তারও কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। ততদিন ও যে ধীর বাতাসে সর্বক্ষণ মৃদু মৃদু দুলতে থাকবে! নাঃ, ওটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেই বাঁচি! বলা বাহুল্য, আমি নিজে ঝঞ্ঝার ভয় অনেক আগেই কাটিয়ে উঠেছি।

হে বৃদ্ধ বট, কথাটা কি তোমার মনের কথা? অচিন পাখি যদিই তার নূতন নীড়ে ফিরে এসে কলকূজনে বক্ষ তোমার ভরিয়ে তোলে, তুমি কি খুব খুশি হও না? তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করি, স্নিগ্ধচ্ছায় আশ্রয়দাতা পুণ্যাত্মা বট পরম সত্যবাদী, তবু এইখানটায় তার দুর্বলতা আছে, নিজের সঙ্গে নিজেই বড় মিথ্যা কথা বলে।

এও হতে পারে, আমার পক্ষে এইসব চিন্তা অবাস্তব ও অবান্তর। তুচ্ছ কবিতা শোনার সূত্রে এক দিনেই স্নেহসঞ্চার কি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সম্ভব? আসল কথা, শিশু-সাহিত্যের চেয়ে মনে মনে হয়তো উপন্যাসের দিকেই ঝোঁকটা ছিল বেশি।

তাই যদি হয়, তবু হতাশ হবার কারণ নেই। শূন্য নীড়ে আবার পাখি উড়ে আসবে। উড়ো পাখি হ'লেও বনের পাখি নয়। খাঁটি খাঁচার পাখি। এবং খাঁচাটা যড় বড়ই হোক, এই শহরের চেয়ে বড় নয়।

এইটুকু তো শহর, পথে ঘাটে, পাবলিক মীটিঙে, উৎসবে এবং ক্রিয়াকর্মে আবার কোনও দিন দেখা হয়ে যাবে। উপন্যাস কিংবা

নাটক লেখা যদি আমার ভাগ্যে থাকে, অন্য কোন অভাবনীয় উপায়েও যোগাযোগ ঘটতে পারে। শুধু সাবধানে থাকতে হবে, যাতে রচনার বিষয়বস্তু লেখকেরও নিজস্ব বিষয়বস্তুতে পরিণত না হয়। আপাতত শিশু-সাহিত্যেই সন্তুষ্ট থাকা যাক।

শিশু-সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র উপকরণ এসে বললে, দাদু, চিঠি পিয়ন দিয়ে গেল।

চিঠি নয়, দৈনিক-পত্রিকা। পোস্ট-পিয়ন নয়, যে রোজ কাগজ বিলি করে, সে-ই ওর হাতে দিয়ে গেছে। বোধ হয় দরজার সামনে খেলা করছিল। নিকটবর্তী মফস্বল টাউনে কলকাতার সংবাদপত্র এজেণ্টদের হাত দিয়ে সেই দিনই পাওয়া যায়।

কাগজটা হাতে দিয়ে যেন আমার পরম উপকার করেছে, এই ভাব দেখিয়ে শিশু-সাহিত্য দৌড়ে চ'লে গেল। কাগজখানা খুলে দেখি, হ্যাঁ, আমার বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। এই জনপ্রিয় পত্রিকাটিতে প্রতিদিনই আমার দেওয়া একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ঐটুকুই প'ড়ে দেখি, আর কিছু পড়বার দরকার বোধ করি না। সেদিন নজরে পড়ল, আমারই বিজ্ঞাপনটার পাশে কে একজন মোটা মোটা অক্ষরে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক-পত্র পরিচালনার জন্য সুদক্ষ ও প্রবীণ লোক চাই।

কালবিলম্ব না ক'রে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম। বিজ্ঞাপন-দাতার নাম ছিল না, বক্স-নম্বরে চিঠি গেল। এই ভাল, একটা কিছু রুচি-সম্মত কাজে লিপ্ত থাকতে পারব, অবশ্য যদি ভাগ্যে জোটে।

এই শহর? এই বাড়ি? কিছুই যায় আসে না। আমার যে সর্বস্থানেই 'বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা'।

দুদিন পরেই জবাব এল। ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে লিখেছে।

আশ্চর্য, এই শহরেরই কেউ! কৌতূহল হ'ল, আগ্রহ তো ছিলই। দেখা করব স্থির করলাম।

কিন্তু আমার গুণপনার প্রমাণ? একরকম কিছুই নেই। এই পদের কর্তৃপক্ষ কি হেডমাস্টারের বিদায়-শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন? কে জানে!…স্বদেশে ও বিদেশে সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত লেখাগুলোই একমাত্র সম্বল, তাও খুব বেশি নয়। তারও থেকে কয়েকটা বেছে সঙ্গে নিলাম।

আমি যে একজন লেখক—সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, কারণ আমি লিখি এবং সেই লেখা ছাপাও হয়েছে। অতিক্ষুদ্র কৈচরা-মৌজার এক-আনির জমিদারও তো জমিদার! প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলতেন—

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা,
কবিত্বং দুর্লভং লোকে শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।

ভাবখানা এই: আশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে নরজন্ম লাভ হয়, কিন্তু বিদ্যালাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; আবার এই বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে মানুষ-ছাঁকা মানুষেরাই কবি কিংবা লেখক হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত শক্তিমান কবি কজন?

কিন্তু কত ডাইল্যুশনে সম্পাদক হতে পারা যায়, কাব্যশাস্ত্রে লেখা নেই। যদি জুটে যায়, সৌভাগ্য বলতেই হবে। লেখক হতে সম্পাদক, একেবারে ডবল প্রমোশন!

রিকৃশা-ওয়ালাকে বলতেই সে ঠিকানা বুঝে নিলে। খুব বেশি দূর নয়, মাত্র বিশ মিনিটের পথ। নির্দিষ্ট সময়ে ও যথাস্থানে গিয়ে হাজির হই।

গেটের গায়ে পিতলের প্লেটে খোদাই করা—প্রভাতরবি রায়। বাংলা হরফে। নামটা মিলিয়ে দেখে, রিক্শা-চালককে অপেক্ষা করতে ব'লে ঢুকে পড়ি। দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের সামনে প্রশস্ত বারান্দা, ঘরের দুয়ারে পর্দা টাঙানো। বারান্দায় উঠে টুকটাক শব্দে বুঝতে পারি, ঘরের ভিতর লোক আছে। বাইরে থেকে ডাকি, মে আই কাম ইন?

সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে জবাব এল, একটু অপেক্ষা করুন। মাত্র এক মিনিট থেমে বললে, আসতে পারেন।

ঢুকেই বুঝতে পারি, এটা একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটরি। ঢিলে পায়জামা, হাতকাটা জামা, পায়ে চটি প'রে এক ভদ্রলোক একমনে কাজ করছেন। দৈর্ঘ্যে আমার সমকক্ষ, কিন্তু প্রস্থটিও তদুপযুক্ত—স্থূলত্বে নয়, শক্তির আধার স্বরূপে। মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই আপনার?

আমি আমার প্রয়োজনের কথা বলি। মুখ তুলে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চাইলেন। বিদ্যাসাগরের কপাল, বিবেকানন্দের চোখ আর মাইকেলের চিবুক দিয়ে তৈরি সে মুখ। (বলা বাহুল্য, ঔপন্যাসিক যা বর্ণনা করেন, পাঠক তার সিকিখানাও গ্রহণ করেন না। সেইজন্য উপন্যাস-লেখকদের সব কথা বাড়িয়ে বলতে হয়।)

তিনি বললেন, ও বুঝেছি। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে। ঐ ঘরে দেখা হবে।—এই ব'লে পাশের ঘরের পর্দার দিকে হস্ত-নির্দেশ করলেন। একটু থেমে কি ভেবে বললেন, আচ্ছা, দাঁড়ান।··· যাও তো পূর্ণিমা, ভদ্রলোককে ও-ঘরে নিয়ে।

যাকে লক্ষ্য ক'রে শেষের কথাটা বলা হ'ল, তাকে আমি এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি। ঘরের এক কোণে টেবিলের কাছে ব'সে নিবিষ্ট মনে

কি লিখছিল। ব'সে ব'সেই বললে, যাই। একটু পরেই এগিয়ে এসে বললে, আস্থন আপনি।

পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। আমি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকি।...

পরিষ্কার গলায় হুকুম এল, কাম ইন, সার্।—এ দেখছি অতি মডার্ন।

হুকুম তামিল ক'রে দেখি, ঘরে সে একা, আর কেউ নেই। জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

বললে, আপনি বস্থন, ডেকে দিচ্ছি! বোধ হয় অন্য ঘরে আছেন। এই ব'লে চ'লে গেল।

আমার একটা সাহিত্যিক ম্যানিয়া আছে, মেয়েদের রূপ-বর্ণনায় তিথির আশ্রয় গ্রহণ করি—দ্বিতীয়া হতে পূর্ণিমা পর্যন্ত। এই মেয়েটির পূর্ণিমা নাম না শুনলেও ঐ বলেই ডাকতাম।

ব'সে ব'সে ভাবছি, এ কোন্ গ্রহের ফেরে প্রবেশ করতে এলাম! আমার 'কর্তৃপক্ষ' হবে ওই ভদ্রলোকের স্ত্রী—তার কাছে তরুণী, আমার চোখে বালিকা! অদৃষ্টে কি লেখা আছে, কে জানে। কিন্তু তখন আর ফেরবারও পথ ছিল না।

এমন সময়, আমাকে অতিমাত্রায় বিস্মিত ক'রে ঘরে এসে ঢুকল নবমীর জ্যোৎস্না অর্থাৎ সেই মেয়েটি, যে বাঁধানো খাতা নিয়ে গিয়েছিল আমাকে কবিতা শোনাতে। পথের ধারের ঘর!

এ বিধিলিপি! নাট্যকার কিংবা ঔপন্যাসিক আমাকে হতেই হবে। তা না হ'লে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন থেকে আরম্ভ ক'রে বর্তমান পরিণতি উপন্যাসের বক্রগতি না নিয়ে সহজ প্রত্যাশিত পথেই এসে পড়ত—দুদিন আগে, না হয় পরে। এর আগেও এ রকম অনেক হয়েছে। হুবহু মিলে যাচ্ছে। যে অত্যাবশ্যকীয় মূল্যবান আংটিটা মাছে গিলেছিল, দরকারের সময় মাছটাই গিয়ে দুষ্মন্তের দেউড়িতে ধড়ফড় করতে থাকে।

বাঘের পেটে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নবকুমার সাক্ষাৎ পেলে সুন্দরী ষোড়শী কপালকুণ্ডলার—সবই কপালে করে! বৃষ্টি যদি না নামত, কমলা যদি না ভিজত, শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' শেষ হ'ত না। নৌকাডুবি সংবাদপত্রের প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়বস্তু, কিন্তু বউ-বদল খাঁটি উপন্যাসের।

আমার উপন্যাসের একমাত্র উপকরণ অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠি। মনে মনে সংকল্প করি, চতুর ডিটেক্‌টিভ যে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তার সন্দেহের পাত্র অপরাধীর অনুসরণ করে, ওর মনের উপর ঠিক তেমনি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্তত শুধু এই কারণেই সম্পাদকের পদটা আমার পাওয়া চাই!

নবমী মোটেই আশ্চর্য হ'ল না—কেনই বা হবে? ও তো দরখাস্তেই আমার নাম পেয়েছিল।

কিন্তু আমার নাম? কেমন ক'রে জানলে ও? আশ্চর্য হই এবং এই ভেবে আরও আশ্চর্য হই যে, আগে কেন আশ্চর্য হই নি?—প্রশ্নটা এতদিন আমার মনেই ওঠে নি। আমার বাড়ীর দরজায় পিতলের প্লেটে কিংবা মার্বেল-পাথরে নাম লেখা নেই—ওসব আমি পছন্দ করি না। উপন্যাস্ ও নাট্য সাহিত্যে যার নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হতে চলল, তার কাছে এ সব তুচ্ছ। পেয়েছি, সুযোগ পেয়েছি!

বটবৃক্ষ, তুমি বড় উচ্চাভিলাষী।

যতদিন না ঝড়ের দাপটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, ততদিন পর্যন্ত তার আকাশস্পর্শী স্পর্ধাটুকু উপভোগ করবার সুযোগ দিলে দয়াধর্মই পালিত হবে।

তা ছাড়া, আরও একটা মস্ত কথা, কেমন ক'রে বুঝলে সে, আমি তার কবিতা শোনবার যোগ্য লোক?

তবে শুনুন, সাহস দেন তো বলি। বাঙালী পাঠকদের আমি বড় ভয় করি, তাঁরা লেখকদের মনের তলা পর্যন্ত খুঁড়ে খুঁড়ে দেখতে চান। মন কিন্তু আঁধার ঘরের কোণ—বিশেষ ক'রে আমার মন, দীর্ঘকালের পতিত বাড়ির ভাঙা ঘর, বহুদিন ধরে একটা মাটির প্রদীপও জলে নি। এরূপ ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি অপরিহার্য। ফলে হতাশ হৃদয়ের নিরুপায় চিৎকার দাম্ভিকতা ব'লে, পরাজয়ের লজ্জা অসামাজিকতা ব'লে পরিগণিত হয়, উন্মাদের অট্টহাসি হাস্যরসের উপকরণ যোগায়। আমার এক কবি বন্ধু রাগলে পরে কেঁদে ফেলতেন, দুঃখ পেয়ে হাসতেন, হাসি পেলে রেগে উঠতেন।

ব্যাপারটা যে কোনও সুপরিপক্ব ঔপন্যাসিক 'কলা'কেও ম্লান ক'রে দেবে। কিছুদিন আগে, কোনও এক সুপরিচিত বাংলা পত্রিকায় আমার একটা লেখা বেরিয়েছিল। আমার কোনও ভক্ত পাঠিকা যদি সেখান থেকে আমার নাম-ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে থাকে, সে অপরাধ আমার নয়।

তারপর প্রশ্ন ওঠে, বাড়ি চিনলে কেমন ক'রে? ডাক-পিয়ন এবং খবরের কাগজওয়ালা ভিন্ন আর কেউ আমার বাড়ি চিনত না। কে জানত, এক বাঙালী তরুণী তার কবিতা শোনাবার জন্য শার্লক হোম্‌সের মতই এতদিন ধ'রে আমার সন্ধান নিচ্ছিল।

অন্তত, গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘ'টে থাকে। হতে পারে, আমার লেখাটাই তাকে গোড়া থেকে আমার সম্বন্ধে নিঃসংকোচ ও সাহসী ক'রে তুলেছিল।

ছেলেরা বলে, আমরা ভাল; মেয়েরা বলে, আমরা। লেখাটাতে এমন একটা সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছিল, যাতে ছেলেরা ভাববে, আমাদের প্রশংসা করা হয়েছে; মেয়েরা ভাববে, আমাদের।

কিন্তু যে মেয়েটি আমার লেখা প'ড়ে গুণগ্রাহিতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছে, নিশ্চয় সে সবার চেয়ে ভাল। আমার সস্নেহ দৃষ্টি অনুধাবন ও অনুসরণ ক'রে সে বললে, আমি জানতে পেরেছিলাম, আপনি আসবেন।

তা তো পারবেই, চাকরির ডাক—একেবারে পাকা নেমন্তন্ন।

কথাটা শুনে নবমীর মুখে পঞ্চমীর ম্লান জ্যোৎস্না ফুটে উঠল। অনুতপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে, না, সে জন্যে নয়। আমার ইচ্ছাশক্তি আপনাকে টেনে এনেছে।

ইচ্ছাশক্তি! তার মানে?

সেদিন সকালে মনে পড়ল, আপনাকে আমার কার্ড দিয়ে আসতে ভুলেছি। ভ্রম-সংশোধনের উপায় স্থির করছি, এমন সময় দরখাস্তখানা এসে পড়ল।

অর্থাৎ মানুষটা অন্যমনস্ক হ'লেও নিমন্ত্রণটা ছিল আন্তরিক।...এখন কাজের কথা বল। মাইনে কত?

আমার কথায় সে বিব্রত হয়ে উঠল। বললে; আপনি করবেন চাকরি নিয়ে আমার কাজ! লোকে বলবে কি?

কেউ আমাকে চেনে না।

ভুল ধারণা। এই সেদিন আমাদের বাড়িতেই জনকয়েক ভদ্রলোক 'ম্যান অ্যাণ্ড উওম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার একটা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আপনাকে আবিষ্কারের গৌরব আমারই প্রাপ্য, এ কথাও তাঁরা স্বীকার করেছেন।

মনে মনে খুশি হ'লেও মুখে বিষণ্ণ ভাব এনে বললাম, তুমি আমাকে হতাশ করলে। আমি যে কাজের অভাবে মারা যাই।

তা হ'লে কাজ পাবেন, মাইনে পাবেন না।—এই ব'লে হেসে উঠল।

তার মুখে হাসির শব্দ এই আমি প্রথম শুনলাম। কে যেন লঘুহস্তে অতি অল্পক্ষণের জন্য হালকা কাঠি ঠেকিয়ে দিলে জলতরঙ্গে !

বটবৃক্ষ, আবার ?

মনে মনে ভাবলাম, মাইনে নেই, তবু এ কাজ ছাড়া হবে না। সম্মুখে 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ'। একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস।

কি করতে হবে আমাকে ?

আমাদের সাহিত্য-প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সাহায্য চাই। একখানা মাসিক-পত্র বের করব মনে করছি, আপনি তার আদর্শটিকে খাড়া ক'রে দেবেন। বিশেষ কিছুই করতে হবে না, শুধু একটু নজর রাখা।

কাজও নেই, মাইনেও নেই, অর্থাৎ আমার চাকরি হ'ল না, কেমন ? তা হ'লে এখন আমি উঠি।

আমার কথায় নবমীর মুখখানা সাদা মেঘে ঢাকা জ্যোৎস্নার মতই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটা সামলে নিয়ে সপ্রতিভ ভাবে বললে, না না, তা কেন হবে ? কাজ আপনি ইচ্ছামতই করবেন, দায়িত্ব নিয়ে নয়, উপদেশ দিয়ে। এর বেশি কি আপনার করতে পারি ?—এই গেল কাজের কথা। চাকরির অপর অঙ্গ, মানে আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি এই বলতে চাই, ও জিনিসটা আপনি যেদিন আমার কাছে চাইবেন, আর না চাইলেও যেদিন আমার দেবার অধিকার হবে, সেদিন ওটা যৎকিঞ্চিৎ থাকা আমার জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে।

মেয়েটা ক্রমেই মুখরা হয়ে উঠছে, কথার মধ্যে ঔপন্যাসিক প্যাঁচও প্রচুর। ক্রমেই আমি বেশি মাত্রায় আশান্বিত হয়ে উঠি। এই সব তরুণ মনে একটুখানি নাড়া না দিলে, পাপড়িগুলো খুলতে চায় না। অতএব—

কিন্তু আমার কর্তৃপক্ষ কে? তুমি, না, মিস্টার রায়? অর্থাৎ চাকরির তৃতীয় অঙ্গ প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ, সেটা কার সঙ্গে হবে?

পরিষ্কার গলায় উত্তর হ'ল, আমার সঙ্গে। কিন্তু ও কথাটা সব ক্ষেত্রে সমান খাটে না। মাইনে-করা মাস্টার তাঁর ছাত্রের চাকর নন নিশ্চয়।

হার মানতে হ'ল। অনুতপ্তের অভিনয় ক'রে বললাম, আমি তোমার চাকরি নিলাম। মিস্টার রায়ের মত হবে তো?

তাঁর সঙ্গে আমার মতের মিল সব বিষয়েই আছে।—হেসে বললে, যদিও মনের মিল একটুও নেই। তিনি আছেন বিজ্ঞান-সাধনায়, আমার আছে কবিতা। কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করি না।

আশ্চর্য এরা! মতের মিল আছে, মনের মিল নেই। অদম্য কৌতূহলে এই বয়সেও আমার বুক ফেটে যাবার উপক্রম। ভদ্রতার খাতিরে কৌতূহল দমন ক'রে সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করি, তা হ'লে আমি বাহাল?

নিশ্চয়। কিন্তু আপনি চা খেয়ে যান।

সে আর একদিন হবে।

নিজের ভুলের জন্য লজ্জিত হ'ল। অতিথিকে পেয়ে, আনন্দের আতিশয্যে অভ্যর্থনাটাই যদি বাদ প'ড়ে যায়, তার চেয়ে আন্তরিক অভ্যর্থনা আর কি হতে পারে?...উঠে দাঁড়াই।

পথ দেখিয়ে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিলে, কিন্তু ভিন্ন পথে, ল্যাবরেটরি-ঘরের ভিতর দিয়ে নয়।

পিছন থেকে ডেকে বললে, মাঝে মাঝে আসবেন কাকাবাবু। আমার তো সব সময়ে যাওয়া সম্ভব নয়!

কাকাবাবু?

ঔপন্যাসিক, সাবধান!

৪

এই তো উপন্যাস! আমি যখন দেশ ছেড়ে চ'লে যাই, পিতৃতুল্য বয়স্কের সঙ্গে অল্প-পরিচিত তরুণীর পূর্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত ভাষায় কথাবার্তা উপন্যাসেও অদ্ভুত ঠেকত। বোধ হয় উপন্যাস থেকেই শিখেছে ওরা। ভাগ্যক্রমে এই ভাষাটা আমারও কিছু কিছু জানা ছিল। আমি এর নিন্দাও করি না, প্রশংসাও করি না; কারণ, এতে লাভ হয়েছে, না, ক্ষতি হয়েছে—মোটেই আমার জানা নেই। আসল কথা, এত কথা সেকালের মেয়েরা জানতই না।

আজ আর দরজা খুলে বসা নয়। সুন্দর একটা গল্পের প্লট জমে উঠেছে। দরজায় খিল এঁটে বাঁধানো খাতাটায় লিখতে আরম্ভ করি—

"মতের মিল ও মনের মিল

প্রথম পরিচ্ছেদ

দাম্পত্যকলহকে সেকালের মনীষীরা রসিকতা-চক্ষে দেখিয়াছিলেন. ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা ভালভাবেই জানিতেন, যেখানে মনের মিলের অভাব নাই, সে ক্ষেত্রে ছোটখাটো মতের অমিলে কিছুই যায়-আসে না। কিন্তু ধীরা ও অধীরের দাম্পত্যজীবনে—"

লেখার ঝোঁক বেশ একটু জ'মে আসছিল, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, বাইরে থেকে শঙ্খধ্বনি হ'ল—বাড়িতে আছেন? আসতে পারি কি?

বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে খিল খুলে দিলাম। তবু ভাবলাম, জগতে সকল মহৎ কার্যই পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সংসার পরীক্ষার ক্ষেত্র।

শুরুতেই গুরুতর বাধা, একে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা ব'লে ধ'রে নিতে পারি।

বিরক্তি বিস্ময়ে পরিণত হ'ল, যখন দেখলাম আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ডক্টর রায়। খেজুর গাছের সামনে শাল্মলী তরু!

রক্তকরবীর কবির পদাঙ্ক অনুসরণে এতদিন নিজেকে বটবৃক্ষের সঙ্গে উপমিত করেছি। এখন তুলনামূলক সমালোচনায় নিজের ভুল বুঝতে পারি।

নবমীর টেবিলের উপর একখানা ছেঁড়া খাম আমার নজরে পড়েছিল, ঠিকানাটা পরিচ্ছন্নভাবে টাইপ-করা। তাতে লেখা ছিল—ডক্টর প্রভাতরবি রায়, ডি, এসসি, (লণ্ডন)। তারপর এই শহরের নাম।

হবার হ'লে এমনি ক'রেই হয়। গল্পের উপাদান আপনি এসে জুটে যায়।

অতি সত্বর বিস্ময় ভয়ে পরিণত হ'ল। একে তরুণ যুবক, তাতে সাহেবী মেজাজ। আমার ভয় হ'ল, তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার যে কাজের বন্দোবস্ত হয়েছে, তা সে পছন্দ করে নি, হয়তো খারাপ চোখে দেখেছে। কে জানে ওদের মনের কথা! তবে তার হাতে বেত নেই দেখে কতকটা আশ্বস্ত হই। বেতের জ্বলুনি আমি সইতে পারি না।

মাথা নীচু ক'রে বাংলা কায়দায় নমস্কার ক'রে হাসতে হাসতে বললে, দেখুন, আপনার পক্ষে যা আমোদ, আমাদের পক্ষে তা বিপজ্জনক হতে পারে। সাহিত্যিক রসিকতা বাস্তব পরিহাসে পরিণত হওয়া উচিত নয়। আপনি বোধ হয় একটুখানি নাড়াচাড়া ক'রে দেখলেন, আজকালকার মেয়েরা কতদূর ধৃষ্ট হতে পারে—এই না?

এদের কথাবার্তা শুনে মনের ভাব বুঝতে দেরি হয়। ভয়, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা নিয়ে আমি তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম।

বললে, আমি তার তরফ থেকে ক্ষমা চাইতে এসেছি। বলেন কি? আপনি হবেন তার সেক্রেটারি? ছেলেমানুষি আর কাকে বলে!

এই কথা! যাক, বাঁচা গেল যে আর কিছু নয়। সামলে নিতে কিছুক্ষণ লাগল। বললাম, বুড়োমানুষি আর ছেলেমানুষিতে তফাৎ নেই বড়। অল্প আলাপেই ওকে আমার ভাল লেগেছে, ওকে আমি সাধ্যমত সাহায্য করতে চাই। তবে আপনার যদি আপত্তি থাকে—

আহা, বেচারা জানে না যে, আমার পেটের ভিতর উপন্যাসের প্লট গিজগিজ করছে। সোৎসাহে বললে, আপত্তি? আপত্তি হবে কেন? তবে আমার হিংসে হচ্ছে দস্তুরমত। আপনার সাহায্য পেয়ে ও আমার আগেই বিখ্যাত হয়ে উঠবে। খানিক থেমে গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল, যথাসাধ্য বিজ্ঞান-চর্চা করি—অতসীর মুখে শুনে থাকবেন। কোনও একটা বিষয়ে রিসার্চ করছি। আমি আমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সব বাংলায় লিখি।

কেন? ওর অসুবিধা প্রচুর।

তা ঠিক। কিন্তু আমরা আমাদের আবিষ্কার ইংরিজীতে লিখব, তবে সাহেবলোক তা দয়া ক'রে পড়বেন—এ আমি সইতে পারি না। গরজ থাকে তো তর্জমা ক'রে নিক না!

বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ভাবুকতা যুক্তিসহ কি না ভেবে দেখবার বিষয়, তবু শ্রদ্ধা হ'ল। সত্যিকার শিক্ষিত স্বাধীন মন, সন্দেহ নেই।

শাল্মলী মানে শিমুল গাছ। বিশালতা তার প্রশংসার দিক। কিন্তু ওর ফুলের একটা কাব্যিক কুখ্যাতি আছে। দেখা গেল, এ ক্ষেত্রে সেটা অবান্তর এবং আমার পক্ষেও। আমার স্থির লক্ষ্য—

অতসী! নবমীর নাম তা হ'লে অতসী। উপন্যাসে মানাবে ভাল। আমরা কোনও দিন স্ত্রীর নাম বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে করি নি—'এ' 'ও'

দিয়ে কাজ সেরেছি। যাই হোক্, বোঝা গেল, মনের মিল না থাকলেও দুজনের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ হয় নি, এখনও আশা আছে।

দুঃখিতভাবে সে ব'লে চলল, কিন্তু আমার ভাষাশিক্ষা মোটেই হয় নি, ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত। লিখতে লিখতে অনেক সময় খটকা লাগে। আমি আশ্চর্য হই, এই রকম শিক্ষার আওতায় কেমন ক'রে এ দেশে বড় বড় কবি-সাহিত্যিক গ'ড়ে ওঠে। সাধারণ শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে প্রতিভার কোনও যোগ নেই, তার জ্বলন্ত প্রমাণ—বাঙালী লেখক।

বক্তৃতার মাঝখানেই ব'লে ফেলি, কিন্তু শ্রীমতীর তো বাংলা ভাষায় দখল ছিল, চেষ্টা করলে সাহায্য করতে পারত।

কি যে বলেন! একখানা বাঁধানো খাতা হাতের কাছে পেলে ওর কবিতা লিখতে ইচ্ছা হয়। কতক মেয়েলী ছাড়া, বেশির ভাগ হালকা প্রেমের কবিতা। পড়তে পড়তে মনে হয়, হয়তো অনধিকার-চর্চা করছে, না হয় আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে আর কাউকে ভালবাসত।—এই ব'লে হাসির সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র কক্ষটি ভ'রে দিলে।

সর্বনাশ! কি সাংঘাতিক ছেলেমেয়ে এইসব আধুনিক তরুণ-তরুণী! ও বলে, মনের মিল নেই; এ বলে, আর কাউকে ভালবাসে! তিরিশ বছর আগে যদি আমার ষাট বছর বয়স হ'ত, এই ধরনের ধৃষ্টতার জন্য অপমান বোধ করতাম। কিন্তু এখন নিরুপায়। উপন্যাস লেখার খাতিরে সবই আমাকে স'য়ে যেতে হবে।

একটা কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ল। অসন্তুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করি, সেই মেয়েটি কে, যাকে সেদিন 'পূর্ণিমা' ব'লে ডাকলেন?

আমার জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে ও কথার ইঙ্গিতে থতমত খেয়ে উত্তর

দিলে, ওর সাহায্যেই কোনও রকমে কাজ চালিয়ে নিই। যন্ত্রপাতি হাতের কাছে এগিয়ে দেয়।

অর্থাৎ সে ওর বিজ্ঞান-সাধনার অ্যাসিস্টাণ্ট, মানে উত্তরসাধিকা। অথচ স্বামী-স্ত্রীতে ভাব নেই। ব্যাপারটা বিশ্রী ব'লে মনে হ'ল। না, উপন্যাস আমার মাথায় থাক্, এদের সংস্রবে আর নয়, কখনও না। ব্যক্তিগতভাবে কোনও ভদ্রলোকই উপন্যাসের চরিত্রে পরিণত হতে চায় না। গম্ভীর স্বরে বলি, আমার হাতে একটু কাজ আছে। ভেবে দেখব, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি যদি। তবে আমার সময় খুব কম।

সময় খুব কম!

আচ্ছা, আজ তবে আসি।—আমাকে গম্ভীর এবং অপ্রসন্ন দেখে চকিতে নমস্কার ক'রেই উঠে চ'লে গেল। প্রতি-নমস্কারের প্রয়োজন বুঝলাম না!

শিমুল গাছের কাঁটা! ফুলও কি তবে তাই?

এই প্রকারের চিত্তবিক্ষোভ গল্প-লেখকদের পক্ষে ক্ষতিকর। আত্ম-সংবরণ করতে কিছুক্ষণ কেটে গেল। এইসব বাধাবিঘ্ন অপরিহার্য ভেবে শান্তভাবে কলম ধরি। হ্যাঁ, কি লিখছিলাম?…ধীরা ও অধীরের দাম্পত্যজীবনে—

"এই ধরনের একটা গুরুতর সমস্যা কোথায় যেন কুণ্ডলাকারে লুকাইয়া ছিল, আজ ধীরে ধীরে তাহা ফণা তুলিতেছে। দংশন করিতে কতক্ষণ? অবশ্য ইহা সত্য যে, মতের মিল লইয়াই তাহারা মিলিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ বহুদিন পরে তাহাদের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়িল, মনের মিল তাহাদের একটুও নাই। কেমন করিয়া হইবে? যেখানে পারস্পরিক বিশ্বাস নাই, নির্ভরতা নাই, সেখানে ভালবাসার স্থান

কোথায়? জীবনে যে ভুল তাহারা করিয়াছিল, তাহার ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করিতে বসিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এ কথা সত্য যে, নরনারীর চিরন্তন বুভুক্ষা লইয়াই তাহারা মিলিত হইয়াছিল। তখন কে জানিত যে, সেই ক্ষুধার অন্তরালে প্রকৃত কোনও চাহিদা ছিল না, নিতান্তই চক্ষুর ক্ষুধা? একদিন যাহা লঘুচ্ছন্দে জীবনের প্রতি পাদক্ষেপকে সঙ্গীতময় করিয়া তুলিয়াছিল, আজ তাহাই গুরুভার হইয়া তাহাদের দৈনন্দিন কর্ম ও চিন্তাকে তিক্ত করিয়া তুলিল। এই নিষ্ঠুর সত্য উপলব্ধি করিয়া উভয়েই পৃথকভাবে শিহরিয়া উঠিল।

শরতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাতে গোপীমোহন দত্ত লেনের দ্বিতল ভাড়াটিয়া বাড়ির নির্জন ছাদে বসিয়া ধীরে এই কথাটাই ভাবিতেছিল। তাহার মাথার উপর দিয়া একটা চিল উড়িয়া গেল। দূরে আগমনীর বাজনা বাজিয়া উঠিল। অধীর বাড়িতে ছিল না, নিকটস্থ রেস্টুরেণ্টে চা খাইতে গিয়াছিল।

—কি ভাবছ ধীরা? কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইল ধীরা। পশ্চাতে অধীর। তাহার এক হাতে চায়ের কাপ অন্য হাতে এক প্লেট গরম সিঙাড়া।

ধীরা উঠিয়া দাঁড়াইল। অধীরের হাত হইতে চা ও সিঙাড়া লইয়া নামাইয়া রাখিল।

—ও কি ধীরা, তুমি কাঁদছিলে?—ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল ধীরা।"

এই পর্যন্ত লিখে ভারি খারাপ বোধ হ'ল। প্রেমের গল্পে কলম পিষে ক্লান্ত হয়েছি কি?

আজ বুঝতে পারছি, কল্পনার ক্ষেত্রে যেসব চরিত্র নিয়ে বেপরোয়া কারবার চালিয়েছি, তারা যদি জীবন্ত মানুষ হ'ত, আর তাদের উপর আমার যদি একটুও মায়া-মমতা থাকত, তা হ'লে ততটা বাড়াবাড়ি

করতে রাজি হতাম না নিশ্চয়। আমারই লেখা 'নিরুদ্দেশ' উপন্যাসের নিরুদ্দিষ্টা অণিমার কীর্তিকলাপ মনে পড়ল। অণিমা যদি আমার মানসকন্যা না হয়ে—না, সে কথা আমি ভাবতেও পারি না। কেউ পারে না।

মাত্র দুদিনের আলাপে নবমীকে আমি যতটুকু স্নেহ করেছি, তাই যথেষ্ট হয়ে প্রেমের গল্প সম্বন্ধে মনকে আমার বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে দিলে।

না, কবিতাই ভাল, সবচেয়ে ভাল শিশু-সাহিত্য।

এই গল্পটাও অসমাপ্ত র'য়ে গেল। আমার পাঠকদের জন্য আমি দুঃখিত; তাঁদের মনে কৌতূহল থেকে যাবে, শেষ পর্যন্ত ধীরা চা-সিঙাড়া খেল, না, কাঁদতে থাকল এবং অন্তিমে—মানে, গল্পের শেষের দিকে তাদের মনের মিল হ'ল, না, একদম ছাড়াছাড়ি? মতের জয়, না, মনের জয়? তবে, এই ভেবে সান্ত্বনা পাই যে, এসব লেখা কোনও দিনই কোনও পাঠকেরই হাতে পৌঁছবে না।

৫

সারস্বত-বিনোদের আস্বাদ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা জানেন, হাতের কাছে সাদা কাগজ, কালিকলম আর অবসর পেলে তাঁরা চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারেন না! যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, এই ধরনের একটা ঝোঁক আমারও ছিল; ছিল কেন, এখনও দস্তুরমত আছে। কিন্তু এই দুটো দিন ধ'রে জ্ব'রো মুখে তামাকের ধোঁয়ার মত ও-জিনিসটা বড় বিস্বাদ ঠেকছে যেন। এই অরুচি যদি স্থায়ী হ'ত!

আজ সকালে উঠে, একটা ঈজি-চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে ব'সে ব'সে

শুধু ভাবছি। মনের ভিতর সন্ধান নিয়ে জানতে পারি, আমার এই অরুচির মূলে ছিল, নবমী। স্বজনহীন জীবনের দীর্ঘ মরুপথে এই বালিকা একটি শ্যাম-সজীব পুষ্পলতার মতই অকস্মাৎ আমার নজরে পড়েছিল। আমার স্নেহবঞ্চিত শুষ্ক হৃদয়ে যে স্থানটুকু সে অধিকার করেছে, সেখান থেকে কিছুতেই তাকে নামিয়ে দেওয়া যায় না।

কোন্ সাহসে অল্প আলাপেই তারা আমায় জানতে দিলে যে, স্বামী-স্ত্রী হয়েও তাদের মনের মিল হয় নি, তা বুঝতে আমার দেরি হ'ল না। আমাদের লেখা প্রেমের গল্পের মালমসলা সব বাস্তবজীবন থেকে সংগৃহীত না হ'লেও বাস্তবজীবনকে তারা কতখানি আলোড়িত করে, স্পষ্টভাবে আমার চোখে ধরা পড়ল। এই অমূল তরু আমরাই আমদানি করেছি, যে সমস্যা হয়তো মোটেই ছিল না সেই সমস্যার সৃষ্টি করেছি।

আজ আমার কল্পলোকের মানসকন্যারা—অণিমা, রেবা, রেখা, অর্চনা, সুধীরা···এরা সব সার বেঁধে আমার মনের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপ করছে যেন। কেউ কেউ বললে, তুমি তো ইচ্ছা করলে আমাদের রক্ষা করতে পারতে; ভক্তি, দয়া, মায়া, স্নেহ, পতিব্রতা—এইসব নিয়ে উপন্যাস লিখতে পার না?—এ যুগের যোগ্য উপন্যাস? তুমি তো এখনও আমাদের ফিরিয়ে আনতে পার, তোমার কলমের জোরে!

কেন পারব না, নিশ্চয় পারি। নূতন তত্ত্বদর্শনে উৎসাহিত হয়ে কলমটাকে বাগিয়ে ধরি, ধ্যানস্থ হই। কতক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলাম মনে নেই, হঠাৎ আমার ধ্যান ভঙ্গ ক'রে মিষ্টিগলায় কে গেয়ে উঠল, মে আই কাম ইন?

কে? কাম ইন। ভেতরে এস।

কিন্তু কেউ এল না।

দরজা খোলাই ছিল, উঠে বাইরের চারদিকে দৃষ্টি চালিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। একটু দূরে ফাঁকা জায়গায় একটা খালি মোটরকার দাঁড়িয়ে রয়েছে, ড্রাইভার ব'সে ব'সে বিড়ি টানছে।

নবমীর গলা ব'লে সন্দেহ হয়েছিল। আমি কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি? নিজের অবস্থা ভেবে চমকিয়ে উঠলাম। হায় হায়, শেষে কি বৃদ্ধবয়সে জড়ভরতের দশা হবে আমার? অথচ দু দিন আগে মনে মনে সব সম্বন্ধ ছিন্ন করেছিলাম।

ভাবতে ভাবতে টেবিলের কাছে এসে বসি। কলমটা নিয়ে নাড়াচাড়া করি। অকস্মাৎ আমারই আলমারির পিছন থেকে হরিণ-শিশুর মত লাফিয়ে এসে সম্মুখে সোজা দাঁড়িয়ে প্রায় মিলিটারি কায়দায় স্যালুট ক'রে বললে, মে আই কাম ইন, সার্?

পূর্ণিমা!

এইটুকু বাচ্চা মেয়ে—আমার কি ছোট মন! এর সঙ্গে ডক্টর রায়কে জড়িত করা উপন্যাসেও অসম্ভব।

কিন্তু আমার তত দোষ ছিল না। শাড়ি পরলে সযত্নলালিত বাঙালীর মেয়েদের বয়সের চেয়ে বড় দেখায়। কেমন যেন 'পাকা গিন্নী' ভাব! মেয়েটা সেদিন শাড়ি পরেছিল। সেকালের বাপমায়েরা অকালে শাড়ি পরিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় ক'রে দিত। এটা তাদের 'পলিসি' ছিল।

আজ তার পরিধানে সাদা কেড্স্, সাদা মোজা, সাদা হাফ্প্যাণ্ট্, সাদা শার্টের ওপর সাদা ওপেন ব্রেস্ট কোট। সর্বশুক্লা সরস্বতী, কিন্তু নারীত্বের চিহ্নমাত্রবর্জিত। ল্যাবরেটরি-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট!...এই অপূর্ব বেশে মা কি আমার শিশুসাহিত্য রচনায় বরদান করতে এসেছেন? শুনতে পাই, কালিদাস প্রথমেই মুখ বর্ণনা করেছিলেন ব'লে দেবী রুষ্টা

হয়েছিলেন। যে ভুল কাইজার করেছিল, হিটলার তা করতে পারে না, ভুল করলেও তা নূতন কিছু হবে—আমি চরণ থেকে বর্ণনা ক'রে কালিদাসের কৃত ভ্রম সংশোধন ক'রে নিলাম।

পরে লক্ষ্য করি, নারীত্বের চিহ্নস্বরূপ শুধু হাতে দুগাছি চুড়ি আর পৃষ্ঠে দোলানো বেণী।

দেবী বরদানে উদ্যত, কিন্তু ততক্ষণে আমার বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেছে। মনে মনে যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করলেও, মুখে গাম্ভীর্য এনে বলি, এসব কি! আলমারির পেছনে লুকিয়ে ছিলে কেন? তুমি ডক্টর রায়ের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট না?

মেয়েটি ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে বললে, হ্যাঁ সার্, আমার নাম পূর্ণিমা দত্ত। আপনাকে সব কথা খুলে বলি সার্। আমি যখন এই ঘরে ঢুকি, আপনি তখন এখানে ছিলেন না। ঢুকেই মনে পড়ল, আপনার পার্মিশান নেওয়া হয় নি। ফিরে যাব, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন।

কিসের পার্মিশান?

ঘরে ঢোকবার, সার্। মে আই কাম ইন!

ওঃ! তাই আলমারির পেছনে লুকিয়ে রইলে?

উপায় ছিল না সার্!

কতক্ষণ ছিলে ওখানে?

আপনি যতক্ষণ আছেন সার্। ভেবেছিলাম, আপনি উঠে গেলেই বেরিয়ে যাব। তারপর পার্মিশান নিয়ে আবার ঢুকব। কিন্তু আপনি আর উঠলেন না, লিখতে বসলেন। তখন বাধ্য হয়ে—

ঘরে ঢোকবার পার্মিশান নিলে ঘরে ঢোকার পর?

হ্যাঁ সার্, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।—হাতজোড় ক'রে ক্ষমা চাইলে।

বাস্তবিক, ভা-রি অন্যায়। ওর যখন এই রকম অবস্থা, আমি তখন অন্য কথা ভাবছি। আমার চিরকালের বদ অভ্যাস—লেখবার সময় একলা ঘরে ব'সে ভাবাবেগে হাত-পা ছুঁড়ি, তার সঙ্গে নানারূপ মুখভঙ্গি। মেয়েটা সব দেখেছে!

আমাকে চিন্তামগ্ন দেখে পূর্ণিমা ভাবলে, আমি তার শাস্তির ব্যবস্থা খুঁজে বের করছি। প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে বললে, দেখুন সার্, আপনি এই কথাটা ডক্টর রায়কে ব'লে দেবেন না।

কোন্ কথাটা?

আমার এই উইদাউট পার্মিশানে ঘরে ঢোকার কথা।

কেন? তুমি ঢুকলে আমার ঘরে, তার সঙ্গে ডক্টর রায়ের কি সম্বন্ধ?

ভারি রাগ করেন তিনি। কাল সন্ধ্যেবেলায় পুরো এক ঘণ্টা টুলের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন।

টুলের ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন? কি করেছিলে তুমি?

পার্মিশন না নিয়েই তাঁর ঘরে ঢুকেছিলাম। সব সময়ে আমার মনে থাকে না সার্।

না, ডক্টর রায়কে আমি কিছু বলব না। কিন্তু আর কখনও এ রকম ক'রো না।

না সার্, কখনও না।

কি করবে না?

অনুমতি না নিয়ে ঢুকব না।

না, তা নয়, তুমি যখন আমার এখানে আসবে, সোজা ঘরে ঢুকে পড়বে। আমার অনুমতি দেওয়াই রইল। বুঝলে?

তা হ'লে কি করব না সার্?

আলমারির পেছনে লুকিয়ে থাকবে না। আর ঘরে ব'সে আমি কি করি না করি, কারও কাছে গল্প করবে না।

নিশ্চয়। ও-সব কথা কি আর কাউকে বলা চলে? লেখকরা বুঝি ওমনি ক'রেই লেখে?

আশ্চর্য, ওর কাছেও খবর পৌঁছেছে যে, আমি একজন লেখক। কথাটা পালটিয়ে নিতে জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে ডক্টর রায় পাঠিয়েছেন?

না সার্, মিসেস রায়। একখানা চিঠি দিয়েছেন। আর বলতে বলেছেন, তিনি খুব ব্যস্ত আছেন, সেইজন্যে নিজে আসতে পারলেন না।

এই ব'লে কোটের যাবতীয় পকেট, শার্টের বুকপকেট এবং আমার দিকে পিছন ফিরে প্যাণ্টের বেল্ট খুলে শার্টের নীচেকার দুটো পকেট তন্ন তন্ন খুঁজে আমার দিকে চেয়ে কেঁদে ফেললে।

প্যাণ্টের পিছনে অজস্র কালির ছিটে। দেখা গেল, টেবিলের দোয়াতটা মেঝের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে,—ব্যাপার বুঝতে দেরি হ'ল না। লুকোতে গিয়ে তাড়াতাড়িতে এই দুরবস্থার সৃষ্টি।

কান্না দেখে দয়া হ'ল। সস্নেহে শুধোই, কি হ'ল? কাঁদছ কেন?

চিঠিটা হারিয়ে ফেলেছি।

তাতে কি হয়েছে। চিঠিতে কি ছিল জান?

জানি সার্, কিন্তু সেও তো অন্যায়।

কি অন্যায়?

পরের চিঠি খুলে পড়া! (দুঃখিত ভাবে) এর জন্যেও খুব বকুনি খাই, কিন্তু লোভ সামলাতে পারি না। ভারি জানতে ইচ্ছে করে, ভেতরে কি আছে! তবে এ চিঠিটা আঁটা ছিল না।

তবে আর দোষ কি! চিঠিতে কি ছিল বলতে পার?

ছাপা চিঠি। সামনের রবিবার সকালবেলায় নন্দিনীর জন্মোৎসব। আপনার নেমন্তন্ন।

নন্দিনী! নন্দিনী কে?

তা জানি না সার্। কথাটা কদিন ধ'রে শুনছি। কিন্তু ডক্টর রায় যদি শোনেন যে, চিঠিখানা আমি হারিয়ে ফেলেছি—

না না, তা তিনি শুনবেন কেমন ক'রে? আমি তো আর বলতে যাচ্ছি না! তোমার ওপর আমি খুশি হয়েছি, তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে।

হ্যাঁ সার্। আপনাকেও আমার খুব ভাল লেগেছে, আপনি বড় লক্ষ্মী ছেলে।—সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় জিভ কেটে—মানে, ভাল ছেলে, মানে ভাল লোক।

আমি খুব জোরে হেসে উঠলাম। পূর্ণিমা ছুটে পালিয়ে গেল। একটু পরেই গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শুনতে পাই।

দোয়াতটা তুলতে গিয়ে দেখি, আলমারির পিছনে প'ড়ে রয়েছে সাদা খাম একটা। খুলে পড়ি, হ্যাঁ, নিমন্ত্রণ-পত্রই বটে। নন্দিনীর জন্মোৎসব। "নন্দিনী"—নবমীর প্রস্তাবিত মাসিকপত্র। তবে রবিবার সকালবেলায় নয়, শনিবার সন্ধ্যাবেলায়।

দু-ভাঁজ-করা ছাপা চিঠিটার সাদা পিঠে হাতের লেখা—

শ্রীচরণেষু,

দাদু, বহুদিন আপনি দেশছাড়া, হয়তো ভুলে গেছেন, এ দেশের ঠাকুরদা-ঠাকুমারা তাঁদের নাতি-নাতিনীদের কত বেশি প্রশ্রয় দেন। সেই সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে, সেদিন আমি যে রসিকতার আশ্রয় নিয়ে-ছিলাম, আপনি তাতে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। অন্যায় না করলেও, নূতন

পরিচয়ে আমার এই ব্যবহার অসঙ্গত হয়েছে—ক্ষমা চাইছি। "নন্দিনী"র জন্মোৎসবে আপনি না এলে সব পণ্ড জানবেন।

প্রণত

শ্রীপ্রভাতরবি রায়

তার এই চাতুর্যটুকু মন্দ লাগল না; কোনও ক্রমে শেষ পর্যন্ত আমার মান রক্ষা করেছে।

একজন ডাকে—কাকা, অন্যজন—দাদু। খুব সম্ভব, এই বিষয়ে তাদের মধ্যে পরামর্শ কিছুই হয় নি। কিংবা এও হতে পারে, এইখানটায় মতের মিল না থাকলেও দৈবক্রমে মনের মিল ঘ'টে গেছে।

কিন্তু বহুদিন আমি দেশছাড়া সে কথা কেমন ক'রে জানলে? মনে পড়ে, কথায় কথায় কথাটা সেদিন উকিলবাবুকে বলেছিলাম। উপন্যাসের প্লট ঘোরালো হয়ে আসছে।

৬

এদের ব্যাপারে ক্রমেই যেন জড়িয়ে পড়ছি। বহুদিন পাড়া-পড়শীর খোঁজখবর নেওয়া হয় নি।

এদের চালচলন দেখে দেরিতে হ'লেও ভিতরের কথা তবু কতকটা বুঝতে পারা যায়, কিন্তু আমার ছোট বন্ধুদের স্বভাব-চরিত্র ভেবে ভেবে কূল-কিনারা পাই না। ওরা আর আসে না কেন? ভাবনা হ'ল। ভাবতে ভাবতে একটা যেন খেই খুঁজে পাই। হয়তো তাই, হয়তো তাই। আজকাল বাড়ির সামনে মাঝে মাঝে মোটরকার দাঁড়িয়ে থাকে। 'সাহেব-মেম' আসে। হয়তো আমার ভীরু পাখির দল ভড়কে

গেছে! মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে উঁকি মারে। চোখে চোখ পড়তেই ছুটে পালায়।

বিকেলবেলায় যে মাঠটায় তারা খেলা করে, সেই মাঠে বেড়াতে গেলাম। দুই পকেটে বিস্কুট লেবেনচুষ। কিছুটা কাজে লাগল। কিন্তু হায়, গাঁদাফুলের সাহায্যে যে সহজ মেলামেশা শুরু হয়েছিল, ঘুষ দিয়ে কি তা ফিরে পাওয়া যায়? বিস্কুট-লেবেনচুষে মুঠো ভ'রে নির্লিপ্তভাবে তারা যে যার ঘরে চ'লে গেল। সন্ধ্যার আঁধার মাঠে নামল। তাদের পিছু পিছু বাসায় ফিরি।

কবিগুরু বলেছেন, 'নন্দনের এনেছে সংবাদ'। মানুষের মন জলের মতই নিম্নগামী। হায়, আমি স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে নেমেছি। বড় হয়ে এক-দিন ওরা ওদের ভুল বুঝতে পারবে, কিন্তু আমার ভুলের সংশোধন নেই।

অথচ এরাই আমার এই শহরের আদি এবং অকৃত্রিম বন্ধু। শিশু-সাহিত্য ছেড়ে, বৃহৎ উপন্যাসের প্লটের লোভে, হে ঔপন্যাসিক, এ তুমি কোথায় চলেছ? পুতুলের বিয়ের পদ্য আর কি তোমার হাত থেকে বেরুবে?—

পুতুরাণীর বিয়ে,
ঢোল বাজনার তালে তালে
দুলছে দোয়েল গাছের ডালে,
শানাই-সুরে সুর মিশিয়ে
শিস দিয়ে গায় টিয়ে!

হেড মাস্টারের 'শোকোচ্ছ্বাস'?—

তোমার অভাবে গুরু
হিয়া কাঁপে দুরু দুরু!

প্রকাণ্ড একটা মালবাহী নৌকার মত, পারিবারিক মর্যাদার পাল

তুলে, উকিলবাবুর সংসার সংসার-নদীতে ধীরমন্থর গতিতে বেয়ে চলেছে। উকিলবাবু ও তাঁর তিন ছেলে মাঝি-মাল্লার দল, কর্ণধার—স্বয়ং উকিলগিন্নী।

আগেই বলেছি, উকিলবাবু নিজে একদিন আমার এখানে এসেছিলেন। ভদ্রতার নিয়মে আমাকেও একদিন তাঁর ওখানে যেতে হ'ল। উকিলবাবু সব সময়েই কাজে ব্যস্ত, ভাবলাম, সন্ধ্যায় গেলে আলাপ-পরিচয়ের সুবিধা হবে। একদিনে কতটুকু পরিচয় সম্ভব? বাড়ির পাশেই বাড়ি।

বৈঠকখানায় ঢুকেই কিন্তু দেখি, সন্ধ্যার পরও উকিলবাবু মক্কেল-পরিবৃত। আমাকে দেখেই চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন, আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়। তক্তাপোশের উপর সতরঞ্চি বিছানো, মুহুরীবাবু ও মক্কেলদের বসবার জায়গা। তাঁর নিজের জন্য টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা।

হাতে ধ'রে সানুনয়ে বললেন, দেখছেন তো ভাই, আমার অবস্থা! নিশ্বেস ফেলবার সময় নেই, সকাল থেকে রাত্রি অবধি। চলুন, ভিতরে গিয়ে বসবেন। হাতে টান পড়ল, অগত্যা তাঁর পিছু পিছু আমি অন্দরে প্রবেশ করি। প্রথম দিনের আলাপে প্রকাশিত হয়, তিনি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। বয়সের হিসাব বৃদ্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়। রোগ থাকলে রোগ-নির্ণয়।

বাড়িতে বউঝি আছে, এইভাবে বিনা-সংবাদে—ভারি সঙ্কোচ বোধ হ'ল। কিন্তু পরে আমার ভুল বুঝতে পারি। উকিল-গিন্নীর শাসন-তন্ত্রে কোনও বধূরই কোনও কারণেই এবং কোনও সময়েই নাকের উপর ঘোমটা তোলবার উপায় ছিল না।

এই যে গো, তোমার নতুন ভাই। চা-টা খাওয়াও। পার তো

এক কাপ চা বাইরের ঘরে পাঠিয়ে দিও।—গৃহিণীকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে শব্দায়মান চটির দ্রুতসঞ্চালনে মক্কেলদের সঙ্গে মিলিত হতে বাইরের ঘরে ফিরে গেলেন। সেইখানেই তাঁর প্রাণের আকর্ষণ।

উকিল-গিন্নী হাসিমুখে বললেন, এস ভাই, ব'স। বড় ঘরের বারান্দায় একটা মোড়া নামিয়ে দিলেন। এখুনি আসছি।—ব'লে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকলেন। একটু পরেই রান্নাঘর থেকে চাপা পরামর্শের আওয়াজ বিনা চেষ্টাতেই শুনতে পাই।

ফিরে এসে আমার কাছে বসলেন, বিনা আসনেই জোড়াসন হয়ে। পরিধানে দামী ধোপ-দুরস্ত শাড়ি, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বললেন, দেখলে ভাই, ভদ্রলোকের কাণ্ড! মক্কেল যেন পালিয়ে যাচ্ছে! ওকালতি নয়—মাছ ধরা! চার ফেলা আছে, দেরি করলে টোপ গিলবে না।

অতঃপর সুবিধার জন্য আমি উকিল-গিন্নীকে 'উকিল-দিদি' ব'লেই ডাকব। এর অর্থ, 'যে দিদি উকিলের জন্যও ওকালতি করতে পারেন'।

যে ভাবে উকিলবাবু চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন, প্রকৃতই তা দৃষ্টিকটু। আমার সঙ্গে তাঁর যে-সম্বন্ধ পাকা করলেন, সাধারণ ভাবে বাঙালী-সমাজে তা গালাগালির সামিল, শুধু উকিল-দিদির মধ্যস্থতায় এইসব ত্রুটি মধুর হয়ে উঠল। বললাম, কাজের লোক; এই বয়সেও খাটতে পারেন খুব।

কাজ, কাজ, কাজ! কাজ বুঝি আমরা করি না?

বধূরা কর্মব্যস্ত। রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ। ক্ষণপরে কলকলধ্বনি। এবং এক মিনিট পরেই আগুন-গলা ঘিয়ের গন্ধে সারা বাড়ি ভরপুর।

উকিল-দিদি ব'লে যাচ্ছেন, এই বয়সে আজও আমি রাঁধি। কর্তার বদ অভ্যেস, তা না হ'লে খাওয়াই হয় না।

উকিলবাবুর শ্রমশক্তির মূল-উৎস খুঁজে পাওয়া গেল। এবার

কিন্তু বধূদের উচ্চ-প্রশংসা করলেন। আহা, ওরা দিন-রাত্তির খাটে! সংসারটি তো কম নয়! ছেলেমেয়েদের ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা আছেই। ওরাই যোগাড় দেয়, আমি শুধু ব'সে ব'সে নাড়াচাড়া করি, ছুটোছুটি আর পোষায় না। ওরাও রাঁধে মাঝে মাঝে। তবে ওদের দৌড় ওই ডাল-ভাত পর্যন্ত।

আমি ভাবছিলাম, উকিলবাবু যদি সটীক দেওয়ানী-কার্যবিধি-আইনের বইখানা আমার হাতে দিয়ে বলতেন—প'ড়ে দেখুন, চমৎকার বই, এর চেয়ে অনেক ভাল হ'ত।

ছেলেরা কলকাতায় চাকরি করে, এক ছেলে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। বড়জন ইঞ্জিনিয়ার।

কিন্তু আমার অদৃষ্টে গুরুতর বিপদ অপেক্ষা করছিল—

এক বধূ আসন পেতে দিয়ে গেল—মূল্যবান্ গালিচা।

অন্য বধূ জল সাপ্‌টে জায়গা ক'রে দিলে।

আসনের দক্ষিণ পার্শ্বে জলপূর্ণ গ্লাস স্থাপিত হ'ল।

অপর বধূ বিরাট থালায় অন্তত পঁচিশখানা লুচি সাজিয়ে আসনের সম্মুখে রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

সার্কাস্ পার্টির কার্যকলাপ দেখেছেন? ততোধিক ক্ষিপ্রতায় থালার চারিপাশে নানান্ সাইজের বাটি প'ড়ে গেল।

এর চেয়ে উকিলবাবু যদি খান-পাঁচেক আরজি-জবাব নকল করতে দিতেন, নিশ্চয় আমি খুশি হতাম।

উকিল-দিদির নিয়মতান্ত্রিক সংসার—আপত্তি ক'রে লাভ ছিল না। শুধু পরিমাণ সম্বন্ধে মিনতি জানাই। আমার বিষয়ে বরাবরই তিনি স্নেহময়ী, বললেন, যতটা পার চেষ্টা কর। যা পারি, তাই খাব, বাকিটা উচ্ছিষ্ট হবে—বুঝলাম, এটাও নিয়মতন্ত্রের অঙ্গীভূত।

মোড়া ছেড়ে আসনে বসেছি, এমন সময় মহাকলরবে এবং দুপ্‌দাপ শব্দে সারা বাড়িখানা তোলপাড় ক'রে উপস্থিত হ'ল—

আমার ছোট বন্ধুর দল। বোধ হয়, মাস্টারের কাছে পাশের কোনও ঘরে পড়াশুনা করছিল। তাদের একজন আমাকে দেখে আয়তচক্ষু বিস্ফারিত ক'রে চেঁচিয়ে উঠল, নতুন দাদু! নতুন দাদুকে তাদের বাড়িতে তারা এই নতুন দেখছে।

নিয়মতন্ত্রে শৈথিল্য দেখা গেল। সুযোগ পেয়ে, তাদের সেই মহাবিস্ময়তরঙ্গে ঢিল ছুঁড়ে দিলাম—এস, এস, তোমাদের জন্যেই ব'সে আছি। ব'সে পড়, ব'সে পড়—রাত হয়ে যাচ্ছে।

উকিল-দিদি হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন। কিন্তু কার কথা কে শোনে! তারা ততক্ষণ আমাকে ঘিরে ব'সে পড়েছে এবং কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে আমিও।

তাদের সাহস দেখে উকিল-দিদি স্তম্ভিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তিনি তো জানেন না আমাদের বিস্কুট-ভাগাভাগির কথা। পুরাতন বন্ধুত্ব ফিরে পেলাম। মনে পড়ল কবি-গুরুর দুটো বহু-পরিচিত গানের লাইন—

"নূতন ক'রে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণ,
আমার ভালোবাসার ধন!"

পরিপূর্ণ আনন্দে আহার শেষ ক'রে বাসায় ফিরি। বলা বাহুল্য, বধূমাতাদের আরও লুচি ভাজতে হয়েছিল।

ফেরবার পথে বৈঠকখানা-ঘরে উপবিষ্ট উকিলবাবু আইনের বই থেকে মুখ তুলে হেসে বললেন, ভায়া চললে? আমিও হেসে তাড়াতাড়ি নমস্কার সেরে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে বাঁচি।—হ্যাঁ দাদা, আসি।

এই গেল পাড়া-পড়সীর কথা। আশ্চর্য, ঘরের কথা আজও আমার

বলা হয় নি। বলতে ভুলেছি। এই রকমই হয়। 'বাতাস জল আকাশ আলো'—বাস্তবজীবনে এদের মূল্য আমরা অনুভব করি না—একান্ত সহজলভ্য ব'লে। শুধু কবিতায় জয়গান করি। মাতৃস্নেহও তাই। সেই রাত্রে আবার একবার কবি-গুরুকে স্মরণ করতে হয়েছিল—

"বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় ক'রে বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।"

বাড়িতে এসে দেখি, সরলা তখনও ব'সে আছে। সরলা আমার ঝি—ডাক-নাম 'সরি'। কেউ কেউ বলত 'গোবরার মা' বাড়ি পাহারার কোনও দায়িত্বই তার ছিল না, তার কাছে বাইরের দরজার অন্য চাবি ছিল। কাজ সেরে সে চ'লে যেতে পারত।

সাবধানে পরীক্ষা ক'রে দেখলে, আমার সঙ্গে অন্য লোক কেউ আছে কি না। নেই। ভৎর্সনার স্বরে বললে, কাণ্ড-কারখানা বটে! আঁধার রাত, বুড়ো মানুষ। আমি তো ভেবেই খুন; দিন দিন তুমি যেন কিসের-পারা হয়ে যাচ্ছ বাবা!

তাই তো! ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। আমার জন্য ভাববার এবং আশৈশব আজ পর্যন্ত আমার অধোগতি লক্ষ্য করবার লোক ছিল, এ খেয়াল আমার মোটেই ছিল না। অপ্রস্তুতভাবে টেবিলের সামনে বসি।

আজ আর লিখতে হবে না, রাত হইচে! খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়।—এই ব'লে সে চ'লে গেল।

ওর শাসনকে আমি ভয় করি। আশ্চর্য, ওর অনুপস্থিতিতেও ওর কথার অবাধ্য হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার শোবার ঘরে আমাদের ইস্কুলের হেডমাস্টার মহাশয়ের একখানি অতি পুরাতন ফোটো টাঙানো আছে। কি জানি কেন, দিনের আলোয় সেই ঘরে ব'সে চুরুট-সিগারেট টানতে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে। সে কত দিনের কথা, কোথায় তিনি আজ! সরির ব্যাপারটাও তাই। তার অযাচিত স্নেহ উপেক্ষা করতে কোথায় যেন আটকে পড়ি।

পাঁচ মাসে সে পাঁচ বার ডাক-পরিবর্তন করেছে। প্রথমে ডাকত, 'সায়েব'। তারপর 'বাবু-সায়েব'। কিছুদিন 'বাবু মশাই'। ইদানীং পরিষ্কার পিতৃ-সম্বোধন। এর পর 'ছেলে' ব'লে কিংবা নাম ধ'রে ডাকলেও বিস্মিত হব না।

তার সংক্ষিপ্ত জীবনী—দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে বিধবা হয়। ওদের সমাজে পুনর্বিবাহে বাধা ছিল না; কিন্তু সরি তা পছন্দ করে নি। 'পাড়াকুঁদুলী' ব'লে নাম-ডাক ছিল যথেষ্ট, কেউ ওর ধার-পাশ দিয়ে ঘেঁষতে সাহস পায় নি। দুঃখে-কষ্টে ছেলেটিকে মানুষ করেছে, মেয়েটি এখনও 'অ-মানুষ'।

ইদানীং দুঃখ-কষ্টের লাঘব হয়েছে। ছেলে রিক্শা চালায়, ছেলের বউ সংসার। তবু নিজে এখনও চাকরি করে। তার রিক্শাতেই প্রথম আমি স্টেশন থেকে এই শহরে আসি। ডক্টর রায়ের বাড়িতে সম্পাদক-পদের জন্য সে-ই আমাকে নিয়ে যায়।

স্টেশন থেকে বাড়িতে ঢুকে পকেটে হাত দিয়ে দেখি, ভাঙানি নেই।

আমার বিপদ দেখে রিকৃশা-ওয়ালা ভদ্রভাবে বললে, এখন থাক। মা এসে কাল 'লিয়ে' যাবে। আমার নাম গোবর্ধন। মায়ের নাম 'গোবরার মা'।

এই সূত্রেই যোগাযোগ। আগেই বলেছি, 'গোবরার মা' সরির অপর নাম। বরং ঐ নামেই সে আপন পাড়ায় সমধিক বিখ্যাত। তাদের পাড়া আমার বাড়ি থেকে একটু দূরে—একখানা মাঠ পেরিয়ে।

আমার এই শহরে পদার্পণের তৃতীয় দিন থেকেই সরলা আমার সকল ভার গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় দিনেও, সে যখন আসে, প্রকৃত রিকৃশা-ভাড়া সংগ্রহ করতে পারি নি, বিরক্ত হয়ে পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে দি, বাকি টাকার জন্য এক রকম হতাশ হয়েই। কিন্তু একটু পরেই গোবরার মা চার টাকা চার আনা ফেরত দিয়ে গেল। সেই সময়ে তার কাছে আমার অসহায়তার কথা ব্যক্ত করি। নিজেই সে রাজী হ'ল।

প্রথম প্রথম খুব সমীহ ক'রে চলত। একদিন—আমি তখন লিখছি—টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে সসংকোচে বল্লে, উঠুন বাবুমশাই, চান করসে। বেলা হইচেন, কখন রাঁধবে, কখন খাবে?

সেদিনের সেই স্নেহময় আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারি নি।

ঘর নিকিয়ে, বাসন ধুয়ে, উনুন জেলে, এমন কি, স্নানের জল তুলে সমস্তই সে প্রস্তুত রাখে। স্নানাহ্নিক সেরে আমি দুটো আতপ চাল ফুটিয়ে নিই। কোনও দিন ডিমসিদ্ধ, কোনও দিন আলুবেগুন। কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত, এক বাটি দুধ, কয়েকটা কলা—এতেই কাজ চ'লে যাবে। আতপ চাল অতি সত্বর অন্নে পরিণত হয়।

বিদেশের ঠাকুর ছেড়ে দেশের কুকুর মাথায় ক'রে নাচতে আমি

সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু এ দেশের রন্ধন-ব্যবসায়ী ঠাকুর-শ্রেণীর জীব বিষয়ে বিভীষিকা আজও আমার মনে আছে।

সরলা আমার কাছে ব'সে খাওয়া দেখে। তার চক্ষে এই দৃশ্য অতীব করুণ। এর ভিতরেও হুকুম চালায়। তার দুর্বলতার সুযোগ বুঝে সাহস ক'রে একদিন বলি, হাঁরে সরি, মা হয়েছিস, ছেলে খাওয়াতে পারিস না—কেমন মা?

কপালে হাত ঠেকিয়ে সে জানায় যে, তার পরকাল আছে। তার পক্ষে আমাকে রেঁধে খাওয়ানো মহাপাপ!

তার কথা এত দিন বলি নি, কারণ সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। অন্য লোক দেখলেই সে নিজমূর্তি সংবরণ করে। নিজমূর্তি যথা—বেলা হ'লেই আজকাল সে সটান এসে মাথার উপর তেল চাপিয়ে দেয়। বলে, কি ছেলে রে বাবা! খাওয়া-দাওয়া ব'লে হুঁশ নাই কো!

আমার ছোট বন্ধুদের বন্ধুত্ব অতি ভঙ্গুর—স্বার্থের সংঘাতে নিকট-প্রতিবেশী উকিল-গিন্নীর ভ্রাতৃস্নেহও হয়তো তাই। কিন্তু আমি স্থির জানি, আমার মনের ধানের শিষে এই একটি অচঞ্চল শিশিরবিন্দু।

না, ওকে না ব'লে আর কোথাও সন্ধ্যার পর যাওয়া হবে না।

৭

শনিবার সন্ধ্যাবেলায় ঠিকানামত পৌছে দেখি, একখানা মাঝারি-সাইজের সুন্দর বাড়ির উপরতলার রেলিঙের সঙ্গে প্রকাণ্ড সাইন-বোর্ড বাঁধা—'নন্দিনী কার্যালয়'। নীচে সিঁড়ির দরজায় উক্ত সাইন-বোর্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ পেরেক দিয়ে আঁটা। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছি,

এমন সময় পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে নিঃসংকোচে আমার হাত ধ'রে বললে, আপনি এসেছেন সার্!

দেবী সর্বশুক্লা! তার পরনে জরি-পাড় শাদা শাড়ি, গায়ে হাত-ঢাকা সাদা জামা, পায়ে সাদা ক্রোমের চটি। এই বয়সে রঙিন জিনিসে অনাস্থা ওর কেমন ক'রে হ'ল?

অভ্যর্থনার ভার তোমার ওপর?

না সার্, আমি জানতাম যে আপনি আসবেন।

ও! এ অভ্যর্থনা তা হ'লে তোমার নিজস্ব?

হ্যাঁ সার্। ওপরে চলুন। কিন্তু—। ইতস্তত ক'রে বললে, সেই কথাটা আপনার মনে আছে?

কোন্ কথাটা?

মুখ নামিয়ে বলতে থাকে, সেই না ব'লে ঘরে ঢোকার কথা? চিঠি হারানোর কথা? একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলেছি সার্। এসব কথা মিসেস রায় জানতে পারলেই ডক্টর রায়ের কানে উঠবে।

সর্বনাশ! তুমি আমাকে কি যে ভাব! এসব গুরুতর কথা কি কেউ কাউকে বলে? তা ছাড়া, আমরা দুজনেই যখন লক্ষ্মী ছেলে-মেয়ে, কেমন না?

এবারে আর লজ্জিত হ'ল না। ওর মাথা থেকে যেন একটা দুশ্চিন্তার গুরুভার নেমে গেল। কৃতজ্ঞভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল—যে কৃতজ্ঞতা বিপদমুক্ত পশুপক্ষীর চোখে দেখতে পাওয়া যায়।

সহসা আনন্দে লাফিয়ে উঠে, আমার জামার পকেটে হাত পুরে, ও আমাকে একরকম টেনে চলল দোতালায়।

সুসজ্জিত ঘর। লোকজনে পরিপূর্ণ, কিন্তু সভার কাজ তখনও আরম্ভ

হয় নি। আমাকে এইভাবে পূর্ণিমার করতলগত দেখে, সকলেরই মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন পরিস্ফুট। তারা তো আমাদের গুপ্তকথা জানে না!

নবমী এগিয়ে এসে প্রণাম করল এবং তার দেখাদেখি আর সব মেয়েদেরও কেউ কেউ। অনাত্মীয়ের প্রতি তার এই শ্রদ্ধা নিবেদন-পদ্ধতি কারও কারও চোখে বিসদৃশ ঠেকল ব'লে মনে হ'ল। আমি কিন্তু বাধা দিলাম না মোটেই। ছেলেরা নমস্কার ক'রে বিনীতভাবে ঘিরে দাঁড়ালো।

ছেলেদের মধ্যে একজন হাত জোড় ক'রে স্মিতহাস্যে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললে, আপনার মত প্রবীণ সাহিত্যিক আমাদের এই ছেলে-খেলায় যোগদান করবেন, এ আমরা আশাই করি নি। আমাদের ইচ্ছা, আজকের অনুষ্ঠানে আপনিই সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

পাতাবাহার!

আমার আর একটা ঔপন্যাসিক-ম্যানিয়া—পুরুষদের গাছের সঙ্গে তুলনা করা। এ পর্যন্ত তিন প্রকারের গাছ আপনাদের আমি উপহার দিয়েছি—বট, খেজুর, শিমূল। অবশ্য বট ও খেজুর একই ব্যক্তিতে (আমি নিজে) আরোপিত হয়েছে। আমার নবাঙ্কুর ছোট বন্ধুরা কোন্ গাছে পরিণত হবে, এখনও ঠিক জানা যায় নি। সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে—কবিত্বরসবর্জিত উকিলবাবুর কোনও উপমাই খুঁজে পাই নি।

পাতাবাহারের প্রাথমিক পরিচয়, যথা—কোঁকড়া কোঁকড়া লতিয়ে-পড়া ভোমরা কালো চুল, গোঁফদাড়ি-কামান মুখখানি সুন্দর, বলিষ্ঠ না হ'লেও সুসমঞ্জস অবয়ব, সর্বাঙ্গে সজীব শ্যামলতা। কিন্তু ওর হাসির বর্ণনা করতে হ'লে মেয়েদের আশ্রয় নিতে হবে—বদসি যদি কিঞ্চিদপি

দন্তরুচি কৌমুদি—অর্থাৎ একটু হাসলেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে!

পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় রজনীগন্ধায়
রূপ-সাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়!

কিন্তু কি সঙ সেজেছে ছেলেটা! পায়ে ফুলকাটা নাগরা জুতো, পরিধানে মুগার পাড়ওয়ালা খদ্দর, গেরুয়া-রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবির ওপর ফিকে সবুজ রেশমি চাদর কায়দা ক'রে জড়ানো। রঙ মাখিয়ে যাত্রার দলের রাধা সাজলে চমৎকার মানাবে তাকে।

বটবৃক্ষ ম'রে গেছে। পাতাবাহারকে দেখে খেজুরগাছের মন বিরক্ত হয়ে উঠল।

অর্থহীন সৌজন্য অনেক সহ্য করেছি, আর ভালো লাগে না। সম্মানিত অতিথির প্রতি এই প্রকারের ভাষা যিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, তাঁর রচনাশক্তি প্রশংসনীয়, কিন্তু অতি-প্রয়োগের ফলে ওর অন্তর্নিহিত অর্থ ফুরিয়ে গেছে। আমার উপস্থিতি কামনা ক'রেই তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল; অথচ সে বলতে চায় যে, আমি আসব ব'লে সে আশা করে নি—আমি এত অভদ্র! বৃদ্ধ হ'লেও নিতান্ত মৃত্যু-পথযাত্রী নই, অতএব আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আমার না আসবার কোনও কারণই থাকতে পারে না। বক্তা আমার সমকক্ষ ব্যক্তি নয়, অতএব সর্বপ্রকারে বিরুদ্ধ সমালোচনার অতীত। তবু তার বয়সের ছেলেমেয়েদের আমি জিজ্ঞাসা করি, এইসব বাঙালীর ধাতে বেশিদিন সইবে কি?

তাদের আমি আরও জানিয়ে দিচ্ছি, যতই ছেলেমানুষের দ্বারা হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই সাহিত্য-চর্চা ছেলেখেলা নয়। যে বালক পরাধীন অধঃপতিত জাতির উদ্দেশে বলেছিল—

ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।

নিশ্চয় সে ছেলেখেলা করে নি।

আমাকে অন্যমনস্ক ও নিরুত্তর দেখে অনেকেই আমার মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পাতাবাহারকে লক্ষ্য ক'রে শুষ্কভাবে জবাব দিলাম, প্রবীণতাই যদি সভাপতিত্বের একমাত্র লক্ষণ হয়, আমার কিছু আপত্তি নেই, সভার কাজ আরম্ভ হতে দেরি কি?

মোটেই না।

আমাকে বসতে ব'লে তারা যে যার কাজে চ'লে গেল। পূর্ণিমা কিন্তু বরাবর আমার কাছ ছাড়ে নি। একটা বড় রকমের আশ্রয় সে পেয়েছে, যেখানে কারও কোনও কথা চলবে না—অন্তত তার তাই বিশ্বাস। কখন সে আমার পকেট থেকে বের ক'রে সিগার-কেস্‌টা খুলে ফেলেছে, গোটা দুই চুরুট মেঝের ওপর প'ড়ে গেল।

এই পূর্ণিমা, ও কি হচ্ছে?—ওর শাড়ির পিছন ধ'রে সজোরে কে টান দিলে। পিছনে তাকিয়ে দেখি—অমাবস্যা!

উপন্যাসে ব্যবহৃত সব নামই কাল্পনিক—অতএব চতুর্থী, পঞ্চমী প্রভৃতির ব্যবহার অশোভন হ'লেও অসঙ্গত নয়। রূপবর্ণনায় সাহায্য করে, কিন্তু ভদ্রতার অনুরোধে আজ পর্যন্ত 'অমাবস্যা' ব্যবহার করি নি, অথচ সত্যের খাতিরে আজ তাই করতে হ'ল। একাদশীটাও বাদ দিয়েছি, ওদের কল্যাণের দিক চিন্তা ক'রে।

বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, আকৃতি ও বেশভূষায় বৈধব্যের পরিচয়। চোখ রাঙিয়ে পূর্ণিমাকে বললে, এ দিকে এস, অসভ্য মেয়ে।

পূর্ণিমাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে আর সকলকে লক্ষ্য ক'রে বললাম, আমার একটা শর্ত আছে। সভাপতির আসনের ঠিক পাশে বসবেন ইনি।—পূর্ণিমাকে দেখিয়ে বললাম, আমার এই সর্বশুক্লা সরস্বতী! ভাষণ তো একটা দিতেই হবে, বাগ্‌দেবী কাছে না থাকলে আমার বাক্‌স্ফূর্তি হবে না।

সস্নেহে নবমী বললে, বাগ্‌দেবীই বটে! যা অনর্গল ব'কে যেতে পারে!

সবাই হেসে উঠতেই অমাবস্যার মুখের আঁধার কেটে গেল। ঠোঁটের কোণে একটু যেন আলোর রেখা। নিরুপায় হয়ে সে আপন আসনে গিয়ে বসল। অতসী এগিয়ে এসে আমাকে সভাপতির আসনে বসিয়ে দিল। সভার কাজ শুরু হ'ল। প্রথমেই মাল্যদান।

এ কাজের ভার পেয়েছিল পূর্ণিমা। টেবিলের উপর রূপোর থালায় সজ্জিত ছিল তিনটি মালা, একটি গোলাপের এবং মোটা, দ্বিতীয়টি রক্তকরবীর এবং মাঝারি, তৃতীয়টি শ্বেতকরবীর এবং সরু। পূর্ণিমা প্রথমেই শ্বেতকরবীর মালাটি আমার গলায় পরিয়ে দিল। কে একজন উঠে এল ভ্রমসংশোধন করতে, কিন্তু আমি ইঙ্গিতে নিষেধ করি। তারপর উচ্চ করতালিধ্বনির মধ্যে গোলাপের মালাটি অতসীর গলায় উঠল।

আমার মনটাকে আজ এমন ক'রে বিগড়ে দিলে কে?—যেন সব-তাতেই মারমুখো, মানে, সমালোচনা-প্রবণ হয়ে উঠছি। করতালি পরিহাস-প্রকাশেও ব্যবহৃত হয়—

রচি গাথা শিখাইব পল্লীবালদলে,
করতালি দিয়া তারা কহিবে নাচিয়া—
'পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি'!

যাই হোক, শেষ মালাটি অর্থাৎ রক্তকরবীরটা দেওয়া হ'ল যাঁর গলায়, তাঁকে আমি চিনি না।

দেবদারু!

শুধু এইটুকু জানতে পেরেছি, এই অনুষ্ঠানে তিনি একজন করিৎকর্মা প্রয়োজনীয় ব্যক্তি এবং আর সকলে তাঁকে 'মাস্টার মশাই' ব'লে ডাকছিল। তিনি সকলের আহ্বানে কর্ণপাত করছিলেন না, লোক বেছে বেছে পরামর্শ দিচ্ছিলেন।

আমার মনে হয়, পূর্ণিমা ঠিকই করেছিল। আর্টের দিক থেকে এর চেয়ে ভাল কিছু করা যেত না! সৌষ্ঠব-বোধে বালিকা-মনের সহজ সরল গতি! তা ছাড়া, কার পর কাকে মালা দিতে হবে এইটাই সে ঠিক রেখেছিল, কোন্‌টা কাকে মনে ছিল না। এমন একটা আনন্দ-উৎসবে তাকে ইতিহাসের পাঠ মুখস্থ করতে দেওয়া উচিত হয় নি।

তারপর গান—উদ্বোধন-সঙ্গীত। অর্গানের দিকে চেয়ে দেখি, সেখানে ব'সে আছে, অমাবস্যা! ও-ই গাইবে নাকি? তাই তো। সভাপতির আদেশ পেতেই ওর কালো সরু কাঠির মত আঙুলগুলো দ্রুত সঞ্চালিত হয়ে উঠল। কি যাদু জানত ওই সব সরু কাঠি, সুমধুর স্বরতরঙ্গে সমস্ত কক্ষ উদ্ভাসিত হয়ে গেল। সহসা অর্গানের স্বর গায়িকার সুললিত কণ্ঠস্বরে আত্মহারা হ'ল। গানখানি কাগজে লিখে সভাপতির টেবিলে রাখা হয়েছিল। ঋগ্‌বেদের একটা ঋক্‌ এইভাবে মূর্ত হয়েছে বাংলা গানে—

তখন না ছিল তারা, রবিশশি পথহারা,
অসীম জলদরাশি অবারিত গগনে—
সহসা তিমির নাশি ভাতিল রবিশশী,
বাজিল আনন্দগীতি দশদিকে পবনে!

কলকল-কল্লোলে সাগর-বারিরাশি
প্লাবিয়া ছিল ধরা—সহসা গেল ভাসি,
বহিল মলয়ানিল, গাহিল বিহগদল,
নন্দিত জীব যত লভি' নবজীবনে।
লক্ষ কণ্ঠে জাগি পূত-প্রণব-বাণী
মঙ্গলে বরি নিল পুণ্য আশিস্ দানি'
স্তম্ভিত নরনারী, নয়নে পুলকবারি,
বন্দে পরম-পদ তপোবনে ভবনে ॥

সঙ্গীত শেষ হ'ল। তুমুল হর্ষধ্বনিতে মন্ত্রমুগ্ধ সভাকক্ষ আলোড়িত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে সভা স্থিরমূর্তি ধারণ করলে, সভাপতির আসন থেকে গম্ভীরকণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল—তারপর প্রস্তাবনা।

প্রস্তাবনা পাঠ করতে উঠলেন মাস্টার মশাই। একহারা লম্বা চেহারা, লম্বা মুখ, গাল বসা। গায়ের রং খুব ফরসা, চোখের মণি ও চুল বরং কটা। সামনের দাঁত উঁচু, কিন্তু একেবারে বে-মানানসই নয়—

দন্তুরাঃ কদাচিন্ মূর্খা দন্তুরাঃ কদাচিৎ সুখী!

আমার নিজেরও দাঁত উঁচু ছিল, আজকাল বিলকুল নির্মূল হয়ে যাওয়ায় সুখ-দুঃখ এবং পাণ্ডিত্য-মূর্খতার উর্ধ্বে চ'লে গেছি!

বেশভূষায় বিশেষ কিছু পারিপাট্য না থাকলেও, ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পিছন-ঠেলা লম্বা চুল—সোজা বাংলায়, 'ব্যাক ব্রাস' করা। কিছুমাত্র ভণিতা এবং নমস্কার না ক'রেই প্রস্তাবনা পাঠ আরম্ভ করলেন।

প্রস্তাবনায় পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যা বলেছিলেন, তার সারমর্ম এই—

কোনও ক্রমেই আমরা আমাদের আদর্শ হতে বিচ্যুত হব না।

সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা মধ্যপথ অবলম্বন করব। যাঁরা বলেন, আর্টের খাতিরে নীতিকে পদদলিত করতে হবে, তাঁরা শক্তিমান আর্টিস্ট নন, সহজপথে সস্তায় তাঁরা নাম কিনতে চান। আর যাঁরা বলেন, নীতিই বড়—আর্ট কিছুই নয়, তাঁরা সাহিত্যের সত্যিকার পূজারী হতে পারেন না। স্বীকার করছি যে, আমাদের কাজ খুব কঠিন, আমাদের দুদিক রেখে চলতে হবে, দুদিক-রাখা বুদ্ধি মোটেই নিরাপদ নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের স্নেহের 'নন্দিনী'কে আমরা এই পথেই বাঁচিয়ে রাখব।

বক্তা ব'লে চলেছেন, কিন্তু তাঁর দাম্ভিক কর্কশ কণ্ঠস্বর একটা অবাঞ্ছিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করলে। তাঁর কণ্ঠস্বরকে ঠিক কাক-কণ্ঠস্বর বলা চলে না, ষাঁড় এবং মুরগীর ডাকে কোরাস্ করলে ঠিক যেমনটি হয়; তার ধরন-ধারণ দেখে ধীরে ধীরে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠল যে, তিনি যেন নিজেকে স্থাপিত ক'রেই নিশ্চিন্ত, আর কাউকে স্বীকার করতে চান না বা পারেন না, তাঁর দৃঢ়সংকল্পের লৌহ-সিংহাসনে তিনি অচল অটল—চক্ষুলজ্জাহীন, কে কি বলতে চায়, কার কি মনোভাব, সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপও নেই।

কিন্তু তাঁর প্রস্তাবনা পাঠ এমনি জোরালো হয়েছিল যে সকলের মুখভাব লক্ষ্য ক'রে বুঝতে পারি, সন্তুষ্ট না হ'লেও সকলেই তাঁকে স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছে।

প্রস্তাবনা শেষ হ'ল, এইবার আবৃত্তি।

আসন থেকে উঠে নমস্কার করল পাতাবাহার। অতিশিষ্টতায় তার সর্বাঙ্গ যেন গ'লে পড়তে চায়।

কবিতাটার নাম "তরুণের অভিযান"। শুনলাম, তার স্বরচিত। কখনও গম্ভীর, কখনও মধুর, কখনও সহজ—নানান্ সুরের সংমিশ্রণে আবৃত্তিটি অপূর্ব হয়েছিল। আজও আমার কানে বাজছে—

যে সাজে কখনও কেহ সাজে নাই,
সেই তো তোমার সাজ,
যে কাজ কখনও কেহ করে নাই,
সেই তো তোমার কাজ!

এতক্ষণে তার সঙ-সাজার তত্ত্ব বুঝতে পারি। বাকি রইল, যে কাজ কখনও কেহ করে নাই।

আবৃত্তি-শেষে কবি গিয়ে নিজের আসনে বসল। নবমীর পাশেই তার জায়গা ছিল। নবমী হেসে তাকে কি বললে, যার প্রত্যুত্তরে, দূর থেকে দেখে আমার ভয় হ'ল, এইবার ও একেবারেই গ'লে প'ড়ে বুঝি!

সভাপতি—আপনারা কেউ যদি কিছু বলতে চান!

কেউ কিছু বললেন না! আমি আশা করেছিলাম, নবমী কিছু বলবে। কিন্তু সেও কিছু বললে না। কিছুক্ষণের জন্য সভাস্থল নীরব।

নিষ্ঠুরভাবে সেই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে অভদ্র শ্লেষের সঙ্গে মাস্টার বললেন, না, কেউ কিছু বলবেন না। আমার পাশে উপবিষ্ট পূর্ণিমাকে দেখিয়ে বললেন, আপনার বাগ্‌দেবী যদি কিছু বলেন! আর বাকি আপনি নিজে।

সেদিন আমি যা বলেছিলাম, মোটামুটি মনে আছে। সাহিত্যিক মতবাদের দিক থেকে আজও আমি সেই কথাই বলব। বাগ্‌দেবীকে স্মরণ এবং লক্ষ্য ক'রে শুরু করেছিলাম—

না, উনি কিছু বলবেন না। সকলের কণ্ঠে বাণী যোগানো যাঁর কাজ, তিনি কি বলবেন? আপনারা ভেবে দেখুন, গোড়া থেকে উনি যদি কিছু বলতে পেতেন, তা হ'লে আমাদের কারও কিছু বলবার সুযোগ হ'ত না, সভার কাজ অচল হয়ে যেত। কিন্তু ওঁর কাজ উনি করেছেন, এরই মধ্যে বার-পাঁচেক তাঁর পা ঠেকেছে আমার পায়ে।

[হাস্য] তার অর্থ—আমাকে সাবধান ক'রে দেওয়া—এই, তুমি সভার কাজে অন্যমনস্ক হচ্ছ কেন ? [উচ্চহাস্য] বাস্তবিক, আমাকে অন্যমনস্ক ক'রে তুলেছিল অতুলনীয় সঙ্গীত, আবৃত্তির সুমধুর ছন্দে আমার মন চ'লে গিয়েছিল অন্যত্র, আমার পূর্ববর্তী বক্তার সুচিন্তিত প্রস্তাব আমাকে চিন্তিত ক'রে তুলেছে। এই সম্পর্কে আমি দু-একটা কথা বলতে চাই। নীতি আর দুর্নীতি সাহিত্যের বিষয়ীভূত নয়, সাহিত্য চলবে নিজের বেগে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সকল সভ্যদেশে যে সব সরকারী আইন প্রচলিত আছে, তাও যদি যথেষ্ট না হয়, সেইগুলোরই সংশোধন আবশ্যক। সাহিত্যের অধোগতি বলতে আমি বুঝি, একঘেয়ে অনুকরণ, গতানুগতিকতা, প্রাণহীনতা। শক্তিহীন লেখকের হাতে নীতি হয় অকর্মণ্য, দুর্নীতি হয় বিপজ্জনক। অবশ্য, 'নন্দিনী'র বিশিষ্ট আদর্শ কি হবে, তা 'নন্দিনী'র কর্তৃপক্ষ মিলেমিশে স্থির করবেন। আমার বিনীত প্রস্তাব—(পূর্ণিমাকে দেখিয়ে) বাগ্‌দেবীর গভীর ইঙ্গিত, 'নন্দিনী'-পত্রিকায় যেন ছোটদেরও বিভাগ একটা থাকে।

সভাপতির ভাষণ শেষ হ'ল। কর্মসূচীতে লেখা ছিল—সঙ্গীত। নির্দেশ দিতে যাব, এমন সময় মাস্টার ব'লে উঠলেন, সভাপতির মত প্রবীণ লোকের মুখে আমরা দুর্নীতির প্রশ্রয় শুনব, মোটেই তা আশা করি নি। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

উত্তেজিতভাবে নবমী বললে, আপনি সভাপতির কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। এটা তর্ক-সভা নয়। আপনি বসুন দয়া ক'রে। এই ব'লে ধীরে ধীরে অর্গানের পাশে ব'সে গাইলে—রবীন্দ্রনাথের "যাত্রা হ'ল শুরু"।

সভাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে একে একে প্রায় সকলেই বিদায় নিলেন। সবশেষে নবমী ঘুরে ঘুরে 'নন্দিনী'-আপিসের সংশ্লিষ্ট প্রেস, সাজসরঞ্জাম,

আসবাবপত্র দেখিয়ে দিলে। মূল্যবান চেয়ার, টেবিল, আলমারি সব। দুয়ার-জানলায় সুদৃশ্য পর্দা। আমাদের সঙ্গে ছিল সেই কালো মেয়েটি যে গান গাইলে, অপ্রসন্ন মুখে মাস্টার, পূর্ণিমা তো ছিলই, আর ছিল বিনয়াবনত পাতাবাহার।

অমাবস্যা বললে, ডক্টর রায়ের টেস্ট্ আছে। তাঁর যত্ন, উৎসাহ, পরিশ্রমেই সব আয়োজন সুন্দর হয়েছে।

ডক্টর রায়! তাই তো তাঁর তো কোনও সন্ধান নেওয়া হয় নি! আমার ধারণা ছিল, এসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ডক্টর রায়ের মোটেই কোনও আকর্ষণ নেই, কিন্তু আমার কথায় আমার সে ভুল ভেঙে গেল। অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করি, এই উৎসবে তাঁকে দেখতে পেলাম না যে?

তিনি অসুস্থ।—আলগা ভাবে নবমী উত্তর দিলে।

অসুস্থ? মনে যেন খটকা লাগল। হতে পারে সামান্য অসুখ, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতি? উৎসব তো দুটো দিন পেছিয়ে দেওয়া চলত!

নিরুৎসাহভাবে সকলের কাছে বিদায় চাইলাম। নবমী গাড়ির বন্দোবস্তও করেছিল। কিন্তু আমি হেঁটে যাওয়াই পছন্দ করলাম এইটুকু পথ—রাত্রি মাত্র আটটা। বৈকালের স্বল্পবর্ষণের পর, প্রকৃতির রাজ্যে পূর্ণিমার আলোকোৎসব চলছিল।

দু-এক পা অগ্রসর হতেই পিছন থেকে পূর্ণিমা ডাকলে, আপনার সিগারেট-কেসটা সার্!

নির্লিপ্তভাবে সেটা পকেটে পুরে নিজের পথ ধরি।

৮

ভাবতে ভাবতে ফিরছি—প্রাণহীন শুষ্ক এদের জীবন-যাত্রা, এখানে ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় নেই। সাহিত্য-চর্চাও এক রকম তাই, কর্মহীন নিরুদ্বেগ জীবনকে উপভোগ করবার উদ্ভাবিত উপায়। অনুষ্ঠানটি একান্ত পারিবারিক, অথচ ডক্টর রায়ের অসুস্থতা বিঘ্ন ব'লে গণ্য হ'ল না। অবশ্য, অতসীকে কিঞ্চিৎ উন্মনা দেখেছিলাম, কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? 'নন্দিনী'র জন্মোৎসব! সাধারণ বাঙালী-সংসারে বিবাহেরও দিন পাল্‌টে যেত।

আশ্চর্য, 'নন্দিনী'-পত্রিকার বাস্তবের দিকটা এরা কেউ আলোচনা ক'রে দেখে নি, আমিও দেখি নি। মফস্বলের মাঝারি শহর—শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে তত বেশি অগ্রসর নয়। কোথায় লেখক, কোথায় পাঠক, যাতে একটা শতপৃষ্ঠাব্যাপী সাহিত্য-পত্রিকা চলতে পারে? স্থানীয় ইস্কুল-কলেজের জন কয়েক মাস্টার-প্রফেসার—অল্পবেতন—ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিতাঙ্গ! সাহিত্য-সাধনার শখও নেই, সময়ও নেই। মৎস্যশিকারী (উকিল-গিন্নীর ভাষায়) উকিলবাবুদের মোটা মোটা আইনের বই সাহিত্য হ'লেও সৎসাহিত্য নয়। টোপে মাছ লাগুক না-লাগুক ছিপ ফেলে সর্বক্ষণ ব'সে থাকতেই হবে। বাকি থাকে কেরানী-মহুরীর দল, তাদের দেখে ভিতর থেকে শুধু একটি কথাই বেরিয়ে আসে—আহা!

কাজেই আজকের অনুষ্ঠানে অভ্যর্থিতের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল এবং অনেকেই আমার অপরিচিত। একটা কথা বলতে ভুলেছি, আমার সভাপতির আসন গ্রহণ কর্‌বার পর, উকিলদাদা উপস্থিত হয়েছিলেন, একটু আগে এলে প্রাবীণ্যের ওজুহাতে সভাপতিত্বের দায়িত্ব তাঁরই ঘাড়ে

চাপিয়ে দিতাম—আমাকে নীতি-দুর্নীতির অপ্রিয় প্রসঙ্গে জড়িত হতে হ'ত না। অদৃষ্ট!

বলা বাহুল্য,উকিলগিন্নী আসেন নি। কায়মনোবাক্যে রন্ধন-বৈজ্ঞানিক, অসার সাহিত্য এবং বাজে বিজ্ঞানের ধার ধারেন না। নূতন নূতন রান্নার বিষয়ে রিসার্চ ক'রে থাকেন।

রিসার্চ! বড বড় শহরের বড় বড় বৈজ্ঞানিকের সাহচর্য ও সহায়তা ছেড়ে এইটুকু শহরের বিরলবসতি-সীমান্তে ভগবানকে সার্চ করা চলে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা একরূপ অসম্ভব। ব্যক্তিগত অর্থে যন্ত্রপাতি কিনে যে ল্যাবরেটারি গ'ড়ে ওঠে, তাতে রিসার্চের ক্ষেত্র কতটুকু? মনে হয়, এও এক খেয়াল, পৈতৃক অর্থ ফুরিয়ে গেলেই চাকরি খুঁজবে।

সহসা আমার মন জ্যোৎস্নালোকে ঝলমল ক'রে উঠল। আমার পরিকল্পিত উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতেই ওদের আসা, বিধি-নির্দিষ্ট কার্য শেষ ক'রেই ওরা এখান থেকে স'রে পড়বে। লণ্ডন ডি, এস-সি—চাকরির অভাব নিশ্চয় হবে না।

মনে শুধু দুঃখ রইল, আমার উপন্যাসের উপকরণ হ'ল তারাই—যাদের ধর্ম অজ্ঞাত, কৃত্রিম শিক্ষাসংস্কার, জটিল মনের গতি, অস্বাভাবিক চালচলন, খামখেয়ালী সাহিত্য, ইউরোপ-ফেরার সার্টিফিকেটের বলে এরাই আবার যে কোনও জায়গায় শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানীয় হয়ে বসে। এ দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতও তাদের কাছে কথা বলতে আমতা আমতা করেন, পাছে কিছু অজ্ঞতা ধরা পড়ে। দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফল!

দীর্ঘকাল ধ'রে ভবঘুরেগিরি ক'রে লাভ হয়েছে শুধু দেশ-বিদেশের অসার অভিজ্ঞতা। একখানা নীরস বই লিখতে পারি, তাতে থাকবে তাদের লাইব্রেরি, হাসপাতাল, ফ্যাক্টরির ফোটো, সৈন্যদের কুচ্‌কাওয়াজ। ওদের মনের কথা, প্রাণের বাণী জানতে হ'লে আজও আমাকে ওদেরই

লেখা গল্প উপন্যাস কবিতা পড়তে হয়। ওদের মনের প্রশ্ন উদ্‌ঘাটিত ক'রে একটা ছোটগল্প লেখবার অধিকারও আমার নেই। তা হোক, তাতে দুঃখ নেই ; কিন্তু আমারই দেশবাসী আমার কাছে পর হবে, দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে—এই বেদনা দুঃসহ। আমার উপন্যাসের বিষয়বস্তু হবে সেই অপরিচিত ভাব-ধারারই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ, দেশের মাটির সঙ্গে যার কোনও যোগ নেই।

নির্জন পথ, অজানা ফুলের গন্ধ পেলাম। কিন্তু সেই গন্ধকেও তলিয়ে দিয়ে, শুকনো মাটিতে অল্প বৃষ্টি প'ড়ে মাটির গায়ের যে গন্ধ উঠছিল, তাকে প্রাণ ভ'রে গ্রহণ করতে আমার সকল ইন্দ্রিয় আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠল। নাড়ীর টান!

নিজেকে যে সাহায্য করে, ঈশ্বর তাকে সাহায্য করেন—সব সময়ে নয়, কখনও কখনও। আর একখানা মাঠ পেরিয়ে আমার বাসা, বাঁ দিকে সরলাদের পাড়া। ছোট ছোট কুটিরগুলি গুজরাটি হাতীর মত দাঁড়িয়ে আছে। কোনটাতে আলো জ্বলছে না, জ্যোৎস্নারাতে দরকারও নেই। যেতে যেতে নজরে পড়ল, একটা কুটিরের সামনে মুক্ত প্রাঙ্গণে কারা যেন ব'সে আছে। সেখানে একটা লণ্ঠন। কালিমাখা কাচের ভিতর দিয়ে যেটুকু আলো দিচ্ছিল, সম্ভবত তার প্রয়োজন ছিল না।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, সেটা একটা গানের আসর। বাজিয়ে ঢোল নিয়ে টুম্‌টাম্‌ শুরু করেছে। একটা সাত-আট বছরের ছেলেকে মেয়ে সাজানো হয়েছে—নাচবে। ভিড় থেকে সম্মানিত দূরত্ব রেখে তারই সমানবয়সী কিন্তু আকৃতিতে ছোট একটি মৃত্তিকানির্মিত বালিকামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। ছেঁড়া কানিতে রঙ মাখিয়ে এবং পুঁতির মালায়, পুঁতির চুড়িতে তাকে যথাসাধ্য সাজানো হয়েছে। লণ্ঠনটা তারই সম্মানে।

আমাকে দেখে একজন তাদের অস্ফুটস্বরে বললে, সরির বাবা!

তাদের কাছে এই আমার সরি-প্রচারিত নূতন পরিচয়। হাঁকডাক প'ড়ে গেল। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর একটা ভাঙা টুল সংগৃহীত ও সম্মানিত দূরত্বে স্থাপিত হ'ল।

টুলবাহক সবিনয়ে বললে, বসুন বাবা। গ্রাম-সম্পর্ক কত সহজে ছড়িয়ে যায়!

কেমন যেন বিসদৃশ বোধ হ'ল—প্রেসিডেণ্ট-পঞ্চায়েৎ কিংবা দারোগা-বাবুর মত। টুলটা সরিয়ে নিয়ে তাদের কাছ ঘেঁষে বসি। তাদের গায়ে মাটির গন্ধ! মুখে? সে কথা থাক্।

লাও হে, ধরো।—ব'লে মূল গায়েন-কবি গান ধরলে। গান, বাজনা, নাচ সমতালে সূচিত হ'ল। গানখানা এই—

ভাদুর—খুঁটে বাঁধা আধুলি,
গলায় ঝোলে মাদুলি,
কলকাতা যাবে ভাদু—ভাদরের শ্যাষ
ভাদু—র‍্যালগাড়িতে চড়েছে,
ইংরিজী পড়েছে,
ভাল লাগে না ভাদুর গাঁ-ঘরের ভ্যাশ।
ভাদু—মুখে মাখে পাউডর, গালে মাখে রঙ,
বলতে পারি না আমি ভাদুর কত ঢঙ!
ভাদু—ঝুলিয়ে বাঁধে ঝুঁটি চেকনিয়া ক্যাশ।
চটি প'রে চলে ভাদু চটাং চটাং,
ঘুরিয়ে পরে শাড়ি ঘাগ্ড়াই-ঘটাং,
ভাল লাগে আমার ভাদুর এ ব্যাশ।

এই ধরনের গান যদি আরও দেখতে চান, একটু কষ্ট ক'রে একদিন এসে আমার অপ্রকাশিত গ্রন্থ 'পল্লীগীতি-রত্নমালা'খানা প'ড়ে যাবেন।

বিনিময়ে আপনাদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, এই ধরণের মেয়ে যদি কলকাতার বাজারে দেখতে পান, দয়া ক'রে আমাকে খবর দেবেন। আপনাদের চিনতে ভুল হতে পারে। আধুলিটি ট্রেনভাড়ায় খরচ হয়ে গেছে, তবে মাদুলিটা একটু সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করতে হবে, দেখতে পাবেন, প্রচুর ঘাগ্‌ড়াই-ঘটাং সত্ত্বেও মাদুলি আমাদের ভাদু-মণিদের বুকের ভিতর র'য়েই গেছে।

নাঃ, মেয়েটা আমাকে ভাবিয়ে তুললে। একখানি আধুলি সম্বল ক'রে কলকাতা যাওয়া তার উচিত হয় নি!

চোখ মেলে দেখি, আমার মাটির ভাদু পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে, সজীব ভাদু ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছছে। রুমাল মানে হলুদ-মাখানো ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। যাক, এখনও তারা কলকাতা যায় নি, তবে ভাদ্রের শেষে যেতে পারে।

কাদের লক্ষ্য ক'রে পল্লীকবির এ পরিহাস, বুঝতে দেরি হয় না। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ভাদু তাঁর স্নেহস্পর্শ হতে বঞ্চিত নয়। ভাল লাগে আমার ভাদুর এ ব্যাশ!

আরও দু-একটা শোনবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সরি হয়তো আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমার বাড়িতে গান শোনাতে যেতে আমন্ত্রণ ক'রে বিদায় নিলাম। মূল গায়েন-কবি কুণ্ঠিতভাবে ঘাড় নাড়লেন।

কি রচনা, কি সঙ্গীতবিদ্যার দিক থেকে তাঁর গানের যে কোনও মূল্য থাকতে পারে, সে কথা এই সুরস্রষ্টা কবি বিশ্বাস করেন না। আমি করি। আমি ভাবছিলাম, উপন্যাসের প্লট যদি না-ই জ'মে ওঠে, পল্লী-গীতি সংগ্রহে ও সম্পাদনায় দিন কাটবে ভাল।

আমার ভিতরকার সমালোচক আমাকে বললে, এই শ্রেণীর সংগ্রহ-গ্রন্থ যা আগে প্রকাশিত হয়েছে, অর্ধেকখানি তাদের ব্যর্থ, কারণ স্বরলিপির সাহায্যে নূতন নূতন সুরগুলি ধ'রে রাখা হয় নি।

মাঠটা পেরিয়ে বাসায় আসি। নিষেধ সত্ত্বেও একজন আমার সঙ্গ ধ'রে পৌঁছে দিয়ে গেল।

বাইরের দরজায় তালা লাগানো নেই। সরি তা হ'লে ভিতরেই আছে। মনে হ'ল, সে যেন কার সঙ্গে কথা কইছে। কড়া নাড়ি। সরি উঠে দরজা খুলে দিলে।

আমাকে ঢুকতে দেখেই একটা ন-দশ বছরের মেয়ে শশব্যস্তে উঠে গলা পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দিয়ে, সংকুচিত ভাবে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রইল। হাঁ, ঐ রকমই বয়স হবে তার, দশের বেশি হতেই পারে না।

সরি তো হেসেই খুন! বোঝা গেল, এইটি সরলার কোলের মেয়ে। কিন্তু ব্যাপার কি? ঐটুকু মেয়ে আমাকে দেখে ঘোমটা দেয় কেন? খুব সম্ভব মেয়েটা বিবাহিতা। ওদের সমাজে এমন হয়। আবার এও হতে পারে, যে-কোনও বয়সের পর-পুরুষের সামনে যে-কোনও বয়সের বিবাহিতা মেয়ের এই প্রকারের লাজশরম ওদের সমাজেরই রীতি। এটিকেট এটিকেটই, সব সময়ে তার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সরি বললে, রাত হইচে, আজ আর ঘরকে যাবো না, বাবা। মা-বিটীতে চট পেড়ে প'ড়ে থাকি রান্নাঘরের বারান্দায়।

পাশের ঘরে তাদের বিছানার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে শুয়ে পড়ি। 'নন্দিনী' কার্যালয়ে সভার শেষে অভ্যাগতদের জন্য কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। আরও চার আঙুল ঘোমটা নামিয়ে দিয়ে ধীর সংযত পাদক্ষেপে মেয়েটা তার মায়ের পিছু পিছু শুতে গেল। চেয়ে চেয়ে দেখলাম, দেখবার মত জিনিস।

৯

ডক্টর রায় অসুস্থ। কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যায় না, ভদ্রতায় বাধে।

না, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, ভা—রি অন্যায়! আশ্চর্য, তাঁর কথা আমার মনেই ছিল না। কি ভাববে ওরা আমার সম্বন্ধে? অতিথি হয়ে গিয়ে গৃহকর্তার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ভুল হ'ল! ছেলেমেয়েদের দলে ভিড়ে এতখানি হুজুগসর্ব্বস্ব হয়ে পড়লাম কেমন ক'রে? আজই একবার যেতে হবে, এই সকালেই—অন্তত ত্রুটি স্বীকার ক'রে ক্ষমা চেয়ে আসতে।

বাস্, ঐ পর্যন্ত। গৃহকর্তার অসুস্থতার জন্য অনুষ্ঠান কেন পিছিয়ে দেওয়া হ'ল না, এর কৈফিয়ৎ আমি চাইব না, ওরাও দিতে বাধ্য নয়—দিতেও পারবে না জানি। দরকারও নেই কিছু। আমার উপন্যাসের নূতন উপকরণ জুটে গেছে। পল্লীগীতি সংগ্রহ তো হাতের পাঁচ।

সকালে উঠেই সরি এসে বললে, আজকের দিনটো ছুটি চাইচি বাবা।

ছুটি দিলাম। কারণ না জেনেই। নিজের অসুবিধার কথা মনে পড়ল। তা হোক। এর আগে সে কোনও দিনই কামাই করে নি।

কারণটা কিন্তু নিজেই সে জানিয়ে দিলে। নিকট-গ্রামে তার বৃদ্ধ বৈবাহিক অসুস্থ। ছেলের শ্বশুর। তত্ত্ব 'লিতে' যাবে। আশ্বাস দিয়ে বললে, তোমার কিছু কষ্ট হবে না বাবা। গিন্নী তোমার চালিয়ে লেবে ঠিক। পাকা গিন্নী। সব কাজ বুঝে লিয়েছে। ভারি তো কাজ।

গিন্নী? আমার গিন্নী? বলে কি!

আমার বিহ্বলতা দেখে সরলা হাসতে হাসতে মেঝের উপর লুটিয়ে

পড়ল। এতক্ষণে বিষয়টা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। মেয়েটাকে সরি বুঝিয়ে দিয়েছে, আমি তার বর।

মনে পড়ল, একদিন আমি বাইরের ঘরে ব'সে একমনে লিখছি, মেয়েটা জানলা দিয়ে ড্যাবডেবে চোখে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শুভদৃষ্টি হতেই ঘোমটা তুলে স'রে গেল। হ্যাঁ, ঐ মেয়েটাই।

তার দোষ কি? মাথায় বিস্তৃত টাক, লম্বা সাদা দাড়ি গোঁফ, দন্তহীন শিশু-সরল সুমধুর হাসি—ঐ বয়সের যে-কোনও বাঙালীর মেয়ের পক্ষে লোভ সংবরণ করা সত্যই কঠিন!

সরি বললে, ক্যামন মিলেচে বাবা—রাজযটক! তুমি বুড়ো, উ আইবুড়ো।

সরি চ'লে গেল। ডক্টর রায়ের বাড়ি আজ আর যাওয়া হবে না। কাল গেলেই হবে। একদিক দিয়ে ভাগ্য প্রসন্ন হ'লেও ঐটুকু মেয়ের উপর সাংসারিক বিষয়ে নির্ভর করা চলে না। একলা বাড়িতে ভয় পেতেও পারে।

একখানা নতুন খাতা বের ক'রে তার মলাটে লিখলাম, 'পল্লীগীতি-রত্নমালা'—মোটা মোটা আলঙ্কারিক অক্ষরে। বারান্দায় শোনা গেল সপ্ সপাসপ্ ঝাঁটার শব্দ। পূর্বরাত্রে শোনা গানখানা মনে ক'রে ক'রে সেই খাতাটার প্রথম পাতায় টুকে রাখলাম। ভিতরে অতি চঞ্চল হস্তস্পর্শ পেয়ে বাসনগুলো কলরব ক'রে উঠল, ঠুং ঠাং—ঠঙাস্! লেখা হ'লে গুন্‌গুন্ ক'রে গানখানার সুরটাকে ধরতে চেষ্টা করতেই কয়লা-ঘরের ফ্যাক্টরি থেকে কানে এসে ঢুকল দ্রুত কর্কশ এবং বলবান ধ্বনি—ঠক্ ঠক্ ঠকাস্! মনে মনে বলি, গিন্নী, তোমার ভয় নেই, কখনই আমি তোমাকে সাপব না, ঠ্যাঙাব না কিংবা ঠকাব না। তবু ভিতরে থেকে ঘন ঘন শব্দ আসে, সপ্ সপ্ ঠং ঠং ঠক্ ঠক্!

এবং বাইরে থেকে কে জলদমন্দ্রে ডেকে ওঠে, দাদু বাড়িতে আছেন ?

না, এ কণ্ঠস্বর ছোট বন্ধুদের কারও নয়। তবে ?

দরজা খুলতেই ডক্টর রায় ঘরে ঢুকল। বিনা অভিবাদনে ও বিনা অনুমতিতেই একটা লোহার চেয়ার টেনে আমার পাশে ব'সে পড়ল। অন্য দরজায় একটা তিন-রঙা পাড়-ওয়ালা ঘোমটা উঁকি মেরেই বিদ্যুৎ-গতিতে অপসৃত হ'ল। ছেলেটা দেখলে কি না, কে জানে!

তুমি না অসুস্থ ?

তেমন কিছু না। সামান্য একটু সর্দিজ্বর। বিকেলে বৃষ্টি না হ'লে নিশ্চয় যেতাম। অতসী বললে, ঠাণ্ডা বাতাসে গিয়ে কাজ নেই! আমি বললাম, দাদু যদি না আসেন, খবর দিও। অগত্যা যেতেই হবে। আপনি না গেলে, সব কিছুই বাঁদরামিতে পরিণত হ'ত।

ভুল ধারণা তোমার। ওদের সত্যিকার গুণী লোক রয়েছে সব। এখনও কানে বাজছে সেই গান, সেই আবৃত্তি। কিন্তু আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

ক্ষমা করা গেল।—একটা পরিস্ফুট রক্তগোলাপ পকেট থেকে বের ক'রে আমার টেবিলে নামিয়ে রাখলে।

অপরাধ না জেনেই ক্ষমা? এমন ক্ষমার মূল্য নেই। তবে কৈফিয়ৎ দাও। আমি জানতে চাই, তোমার অসুস্থতা সত্ত্বেও উৎসব-অনুষ্ঠান সম্ভব হ'ল কেমন ক'রে ?

সে কৈফিয়ৎ আমার নয়—ওদের। ওদের হয়েই বলছি। আগেই বলেছি, আমার অসুস্থতা আকস্মিক। তা ছাড়া মাস্টার চাপ দিচ্ছিল—অনুষ্ঠানে দেরি হ'লে 'নন্দিনী' নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হতে পারবে না।

মাস্টারটি কে? 'নন্দিনী'র সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

'নন্দিনী'র নবনিযুক্ত কর্ম-সচিব।

যোগ্য ব্যক্তি। বেশ কড়া লোক বলতে হবে। কোথায় সংগ্রহ করলে ?

শ্বশুরবাড়ির দেশের লোক। সাহিত্য-চর্চা করে জানা ছিল। আমিই আসতে লিখেছিলাম। অনেক আগে অতসীর গুপ্ত-শিক্ষক ছিল।

গুপ্ত-শিক্ষক ?

হ্যাঁ, মানে, প্রাইভেট টিউটর। আজকাল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিজেই তৈরি করছি। কেন, পড়েন নি অমৃত বসুর 'কৃপণের ধন' ?—

তার পরেতে মাস্টার মশাই,
তোমায় আমি হৃদে বসাই !

আবার বাঁকা কথা! এরা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলবে দেখছি! কিন্তু আমার মাথার উপরও যে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসছে, সে কথা আমার জানা ছিল না। ভিতরে চীনামাটির বাসনের টুং টাং শব্দ। গিন্নী আমাকে টাঙিয়ে রাখতে চায়। ডক্টর রায়ের অসম-রসিকতার প্রতিবাদের ভাষা ও রীতি মনে মনে ঠিক করছি, এমন সময়—

সেই কক্ষে আবক্ষ-অবগুণ্ঠিত গিন্নীর আবির্ভাব! তার হাতে ঝকঝকে মাজা রেকাবির উপর পরিচ্ছন্ন পেয়ালায় দু কাপ গরম চা। টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। একটুও চা ছিটকে পড়ল না।

ডক্টর রায়—বেকায়দায় প'ড়ে এখন থেকে তাকে আমি প্রভাত ব'লেই ডাকব—বিস্মিত, স্তম্ভিত, হতবাক। নিজে আমি গিন্নী-গৌরবে স্ফীতবক্ষ। আমার অবিবাহিত দাম্পত্য-জীবনের বর্তমান অবস্থা প্রভাতের কাছে খুলে বলতে বাধ্য হই। প্রভাত-রবির উদার হাস্য আমার বসবার ঘরটিতে ছড়িয়ে গেল।

হাসি সামলিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল, কিন্তু আশ্চর্য, মাস্টারের নিয়োগে আপনার মেয়ের আপত্তি ছিল। কি জানি, কেন!

আমার মেয়ে! সে আবার কে?

নতচক্ষে উত্তর দিলে, মানে, আমার স্ত্রীর। অতসীর।

এ সম্পর্ক কখন হ'ল?

আপনারা জানতে পারেন নি, কিন্তু হয়েছে। আমার বুঝতে বাকি নেই, কিসের আকর্ষণে জেনে-শুনে আপনি তাদের এই নিষ্ফল প্রচেষ্টায় যোগ দিয়েছেন।

সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি। কিছু কি সঞ্চিত আছে আজও? আছে, আছে। এতদিন বুঝতে পারি নি, আজ দেখছি, একবিন্দু স্মৃতি অশ্রুকণার মতই টলমল করছে আমার মনের পদ্ম-পাতায়। কিন্তু সে বড়ই ক্ষণিক, ঝ'রে পড়তে তর সইল না।

শুষ্কভাবে বললাম, না না, তা শুধু নয়। ওদের সকলকেই আমি ভালবাসি। দেশ-বিদেশে অনেক ঘুরেছি, এমনটি আর কোথাও দেখি নি, এই বাংলার ছেলেমেয়েদের মত।

এর থেকে প্রমাণ হ'ল যে, আপনি একজন খাঁটি বাঙালী।

তাও নয়। বিদেশী ব'লে তাদের আমি ভিন্ন চোখে দেখি নি। কোথাও চওড়া বুকের পাটা দেখে শ্রদ্ধা করেছি, বিস্মিত হয়েছি তাদের মনের ব্যাপকতা দেখে, কর্মে জ্ঞানে অদম্য উৎসাহে। কিন্তু বাল্য থেকে বাঙালীর এই মনের মাধুর্য জগতে অমিল। এদের পিতৃত্ব, এদের মাতৃত্ব ছেলেবেলা থেকেই স্ফুরিত হয়। তাই এরা বাপ-মাকে ভালবাসে, ভাই-বোনদের সঙ্গে এদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—বিনা দ্বিধায় অল্পসময়ের মধ্যে পরের সঙ্গে আত্মীয়তা ক'রে বসে। শিক্ষার দোষে কিছু কিছু অতিক্রম ঘটেছে হয়তো। ভাবপ্রবণতা ব'লে উড়িয়ে

দিতে চায়, কিন্তু সে তাদের মনের কথা নয়, ও-পথে তারা সুখ পায় নি। তুমি কিন্তু আমাদের নব-প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের সম্মান রাখ নি, সঙ্গতিও না।

সেটা আপনার ভুল দাদু। সাহিত্য করেন, লজিক পড়েন নি? ওটা প'ড়ে ফেলবেন, কাজে লাগবে। আপনার সঙ্গে আমার, আর আমার সঙ্গে অতসীর সম্বন্ধ—এই দুটো দিক ঠিক রেখেছি। অতসীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক—আমার পক্ষে পরচর্চা। কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত ওরা সবাই আপনার কথাই বলছিল।

এদের কাছে হার না মেনে উপায় নেই।

কবিযশোলিপ্সু সারা জীবন ধ'রে ব্যর্থপরিশ্রম ক'রে অবশেষে যখন যশোলোভে সমর্থ হয়, তখন এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, তার কবিতা অপর সকলের চিত্ত হরণ করতে পেরেছে। তার লক্ষ্য ছিল কবিতার সাফল্য, আত্মগৌরব নিশ্চয়ই নয়। গর্বে আমার মন ভ'রে গেল। ওরা আমাকে ভালবেসেছে, ওদের আমি আকর্ষণ করতে পেরেছি! কবি চান জনসাধারণের প্রীতি, তারা তাঁকে যশের মালা পরিয়ে দূরে ঠেলে রাখে।

অধিকতর সম্ভোগের লোভে জিজ্ঞাসা করি, ওরা কে? কে কে ছিল আমার নিন্দা-প্রশংসায়?

এই অতিরিক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলাম আমি, সভ্য ছিলেন আপনার মেয়ে, অনুবউদি, কিশোরবাবু—আর অসভ্যতা করছিল শ্রীমতী পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা। তত রাত্রি পর্যন্ত জেগে ছিল?

মনে হয়, আমার মতই সেও আপনার প্রেমে পড়েছে।

সে সৌভাগ্য ঘরে-বাইরে প্রচুর—দেখতেই পাচ্ছ। কিশোরবাবুটি কে?

'নন্দিনী'র সহ-সম্পাদক। এর বেশি পরিচয় আমার জানা নেই। একদিন ল্যাবরেটরি-ঘরে কাজ করছি, আকস্মিক ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে বললে, একটা কবিতা লিখেছি সার্, শুনবেন? এই ব'লে কাগজের ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করলে, "তরুণের অভিযান"। পরে শুনলাম, ওই ওর স্বভাব। পান-বিড়ির দোকানে ব'সে, ফেরিওয়ালাকে রাস্তায় ধ'রে কবিতা শোনায়।

আহা বেচারা! কবিদের আত্মপ্রকাশের দ্বিতীয় পথ আমার জানা নেই। কিন্তু এইখানটায় সে দুর্বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে। বৈজ্ঞানিককে কবিতা শোনানো!

মোটেই না। ঠিক জায়গায় ঘা মেরেছিল। বিব্রত হয়ে আমি পাশের ঘরটা দেখিয়ে দি। কবিতা শুনিয়ে আপনার মেয়ের কাছে ও চাকরি আদায় করেছে, একবারে সহ-সম্পাদকের পদ।

পাশের ঘর—মানে যে ঘরটা প্রথম দিন তুমি আমাকে দেখিয়েছিলে?

ঠিক তাই। বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটারির পাশে কবিতার ফ্যাক্টরি!

প্রাণহীন বিজ্ঞান এতদিনে পূর্ণতা পেতে চলেছে!

আপনার আশীর্বাদ শিরোধার্য। অনুবউদির অর্গানটা এনে যন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে দেব।

তোমার অনুবউদির পরিচয় নেওয়া হয় নি।

কালকের অনুষ্ঠানে প্রথম গানখানা সে-ই গেয়েছিল। আমার এক বন্ধুর বিধবা পত্নী। সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী, দেখাশুনা করি—এই পর্যন্ত। মেয়েদের গান শিখিয়ে বেড়ায়, আপনার মেয়েকেও। কেউ নেই ওর, সম্বল শুধু ঐ মেয়েটি

কোন্ মেয়েটি?

পূর্ণিমা।

আমি তো অবাক! অমাবস্যার মেয়ে পূর্ণিমা? আমার শুষ্কপ্রায় কবিপ্রাণে নূতন ক'রে ভাবের বন্যা ছুটে গেল। মনে পড়ল পৃথিবীর সেই অদৃশ্য রূপ, অবিমিশ্র অন্ধকারের তলে প্রলয়পয়োধির কালো জল কল্লোলিত, আর তারই গর্ভে জন্ম নিলে সূর্য, চন্দ্র—পরিপূর্ণ প্রতিভায় এবং সমুজ্জ্বল মহিমায়। এই ভাবটিই কালকের গানে ফুটে উঠেছিল অন্তর কণ্ঠে।

আমার এই ভাববিহ্বলতা লক্ষ্য ক'রে ডক্টর রায় মনে ভাবলে, আমার মাথায় সাহিত্য-রচনার ভর এসেছে।—আপনি বোধ হয় এই সময়টা লেখেন? আপনার সময় নষ্ট হ'ল। বেলা বাড়ছে, আমিও উঠি। কখন আসছেন আপনার মেয়ের বাড়িতে? এই ব'লে উঠে পড়ল।

আপনার মেয়ে! ছোট কথাটা ছেড়ে বড় কথাটা ধরল কেন? আমার কাছে নাম ধ'রে ডাকতে কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে। সাহেবিয়ানার মুখোস ধীরে ধীরে খুলে আসছে কি?

আছে, যথেষ্ট আশা আছে।

১০

বাস্তবিক বেলা হয়েছে। আহারাদির জন্য উঠে পড়ি। আদিটা আগে, আহার পরে। আদিগুলোর ওপর ভয় ধ'রে গেছে। আজ আবার সরি নেই। স্নানের জল কুয়ো থেকে নিজেই তুলে নিতে হবে। মেয়েটা কি করেছে, কে জানে! হায়, লেখকরা যদি বায়ুভুক্ হ'ত!

না, সরলা সেই ভোরে উঠে স্নানের জল তুলে রেখে গেছে।

রান্নাঘরে ঢুকে দেখি, সব প্রস্তুত। রান্না পর্যন্ত। পরিষ্কৃত থালায় পরিচ্ছন্নভাবে ভাত বাড়া, আসনের সামনে নামানো আছে। ডান

দিকে জলের গেলাস, ছোট রেকাবিতে ঢাকা। থালাটার এক কোণে লবণগুঁড়া, এক পাশে চাক্ চাক্ আলুভাজা, এক বাটিতে ডাল, এক বাটিতে ঝোল। আসনে বসতেই হাতায় ক'রে গরম ঘি ঢেলে দিলে ভাতের উপর গিন্নী।

উচ্ছ্বসিতভাবে ব'লে উঠি, ও গিন্নী, করেছ কি? ভোজবাড়ি না কি?

ভোজবাজি! ঘোমটা তুলে আমার পানে চেয়ে ফিক ক'রে হেসে দিলে গিন্নী।

আপনাদের বলতে আমার লজ্জা করছে—সেই নির্জন রান্নাঘরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠে সাদা দাড়িতে আঙুল চালাতে থাকি।

বাড়িতে কেউ নেই—সে আর আমি। এখন আবার লজ্জা কিসের? ঘোমটা উঠেছে মাথার ওপর।

ত্বরিত গতিতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ঘটিতে ভরলে আঁচাবার জল। বারান্দায় ঘটিটা নামিয়ে, গামছাখানা নিঙড়িয়ে ভাঁজ ক'রে ঘটির মুখে বসিয়ে দিলে। আচমনের পর রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি চালিয়ে দেখি, আমার পাতে খেতে বসেছে গিন্নী।

আজকালকার ছেলেদের মায়ের চেয়ে বউয়ের ওপর টান বেশি; কিন্তু সে অন্য অনেক কারণে ঠিক এই কারণে নয়। আমার কেস্‌টা একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

কিন্তু মাছ কোথায় পেলে ও? মাছের ঝোল? জিজ্ঞাসা ক'রে জবাব পাই নি। সরি এলে সন্ধান নিতে হবে।

দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই। কিন্তু সেদিনের সেই ভূরিভোজনের পর তা অনিবার্য হয়ে উঠল। 'সোনার তরী'খানা নাড়াচাড়া করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি।

বেলা আন্দাজ তিনটে হবে, গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙে গেল।

দ্বারে অসংখ্য করাঘাত, পরে পদাঘাত। সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রিত চিৎকার—দাদু, ও দাদু, শীগগির এসো, মজা ত্থাখসে।

দরজা খুলে দেখি, হৈ-হৈ কাণ্ড, রৈ-রৈ ব্যাপার! সমগ্র পল্লী তোলপাড়! পাড়ায় বাঁদর-নাচাতে এসেছে।

একজন বললে, দাও না দাদু দুটো পয়সা। হনু নাচাবে।

দুটো পয়সা অতি তুচ্ছ, এই প্রকারের আক্রমণে সর্বস্ব দিয়ে সন্ন্যাস নিলেও ক্ষতি ছিল না।

আমার সম্মতি বুঝে সুবিজ্ঞ বানরস্বামী হনু নাচাতে শুরু করলে। তারও মুখে আদি-মানবের ছাপ সুস্পষ্ট। হাতের ছড়িটা মাটিতে ঠুকে তালে তালে—

তাক্ তুড়াতুক্ তুড়াক্ যাদু—ব্যালফুল আমার নেচে,
আচ্ছা ক'রে বাহার ক'রে—ও ব্যালফুল নেচে!
ও ব্যালফুল—ঘুরে ফিরে,
ও ব্যালফুল—ধীরে ধীরে,
ও ব্যালফুল—দু হাত নেড়ে,
ও ব্যালফুল—আঁখি ঠেরে!

বানরীটা সত্য সত্যই আঁখি ঠারবার চেষ্টা করে।

নৃত্যের পর অভিনয়। বললে—শ্বশুরবাড়ি যাবি? বনের পশু, শাড়ি কোথায় পাবি? ডান হাতে ধ'রে লেজটাকে ঘুরিয়ে কর্ না শাড়ি, কপালে বাঁ হাত তুলে ঘোমটা। বাঁদরীটা তাই করলে। সঙ্গে সঙ্গে ফের ছন্দমাধুর্যপূর্ণ কবিতায়—

তাক্ তুড়াতুক্ তুড়াক্ যাদু—যাচ্ছ শ্বশুরঘর,
তাক্ তুড়াতুক্ তুড়াক্ যাদু—মনের মতন বর!

তাক্ তুড়াতুক্ তুড়াক্ যাদু—ঘন দুধের সর,
অক্ তুড়াতুক্ তুড়াক্ যাদু—শাশুড়ী মাগী পর!
তাক্ তুড়াতুক্ তুড়াক্ যাদু—ননদ মারে চড়,
তাক্ তুড়াতুক্ তুড়াক্ যাদু—লক্ষ্মণ দেবর!

মাত্র কয়েকটি শব্দের নিপুণ বিন্যাসে ব্যালফুলের শ্বশুরবাড়ির চিত্র ফুটে উঠেছে। সুখদুঃখময় সংসার—ভালতে মন্দতে মেশামেশি। স্বামী-দেবরের সুখ আছে, খাওয়া-পরারও; কিন্তু হায়, বউ-জ্বালানী শাশুড়ী ননদ! তবে, দুঃখ কখনও চিরস্থায়ী হয় না—

ননদ গেল শ্বশুরবাড়ি, শাশুড়ী গেল ম'রে,
তাক্ তুড়াতুক্, তুড়াক্ যাদু—সুখেতে ঘর করে!

নাটকীয় আর্টের দিক থেকে এই পর্যন্ত বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। পালা সাঙ্গ হ'ল সমুদ্র-লঙ্ঘনে। রামচন্দ্র সীতা-উদ্ধারে বানরীর সাহায্য নিয়েছিলেন, রামায়ণে সে কথা নেই।

শেষে পয়সার জন্য বানরীটা এসে আমারই পা জড়িয়ে ধরল। একটা একআনি ফেলে দিলাম। ও তা নেবে না—মান ক'রে স'রে গেল। দুআনি—তাও না। সিকিতেও মন উঠল না। আধুলি ছুঁড়ে দিতেই গলার শিকলে টান পড়ল, কুড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল।

অভিনয়-দর্শনে সমাগত ভদ্রমণ্ডলী আনন্দবিহ্বল। ভদ্রমহিলারাও তাই। চেয়ে দেখি, গিন্নী কখন তাদের দলে ভিড়ে গেছে, ঘোমটা গেছে খ'সে। এমন কি—

বুকের বসন গিয়াছে খুলিয়া,
কবরী গিয়াছে টুটি।

আমার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে, অন্য সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে

মিশে, আত্মহারা গিন্নী বাঁদর-নাচের পিছু পিছু চ'লে গেল। জল তোলা থেকে বিছানা পাড়া পর্যন্ত সব কাজ আমাকেই করতে হ'ল।

এখন থেকে তাকে আমি ব্যালফুল ব'লেই ডাকব। বার বার গিন্নী ব'লে ডাকা—আমার বুঝি লজ্জা করে না?

১১

সরলা সেই রাত্রিতেই ফিরে আসে। পরদিন ভোরে উঠে এসে শুধোয়, আমার কিছু অসুবিধে হয়েছিল কি না! একটি কথায় সরল-ভাবে উত্তর দিলাম, না। গিন্নীর রেঁধে খাওয়ানোর কথা, বাঁদরের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া—এ সব কথা গোপন ক'রে গেলাম। জানতে পারলে সরলা ওকে আস্ত রাখত না। আমাদের দাম্পত্য ব্যাপার—সব কথা কি বাড়ির লোককে বলা চলে?

কিন্তু মাছ? মাছ কোথা থেকে আনলে? বেশ বড় বড় কইমাছ! সন্ধান নিয়ে দামটা মিটিয়ে দিস।

আমার কথা শুনে সরলার চক্ষু স্থির। কিন্তু পরক্ষণেই হেসে ফেললে। বললে, কাল রেতেই আসতোম বাবা। বুড়োমানুষ, একেলা ফেলে রেখে মনটো আমার ধুকফুক করছিল। বেয়াই ভালোই রইচে, টুকচে জ্বর আইছিল। মালোয়ারি। তত রেতে ফিরে এসে দেখি, বউটো ব'সে ব'সে কাঁদচে, গোবরা তাকে ধ'রে ঠেঙিয়েচে।

বউকে মেরেছে? কেন? কি করেছিল সে?

গোবরা নিজের তরে দুটো কইমাছ জীইয়ে রেখেছিল। বউকে বলেছিল ঝোল রাঁধতে। মাছ দুটো বিড়েলে খেয়েছে।—খুব হাসতে থাকে সরি।

বিড়ালদম্পতির মৎস্যভক্ষণতত্ত্ব বুদ্ধিমতী সরলার বুঝতে বাকি নেই। মোটেই অসন্তুষ্ট হ'ল না। বললে, ভালোই হইচে, ভ্যাবভোগে নেগেচে। মাছের ঝোল রাঁধতে জান বাবা? আমি মাছ লিয়ে আসব।

না সরি, রোজ রোজ ও-সব ঝঞ্ঝাট সইতে পারব না। ছেলেমানুষ, হাতে ক'রে নিয়ে এল, তাই।

শরতের ক্ষণস্থায়ী ছিন্ন মেঘে সূর্য ঢাকা পড়লে পৃথিবীর গায়ে যে ছায়া নেমে আসে, সরির চোখের' পাতায় সেই লীলা খেলে গেল। কর্তা-গিন্নীতে ভালই সংসার চালিয়েছি, একদিনেই এতখানি মনের মিল (মতের মিলও), আমাদের দাম্পত্যজীবন সুখের হবে—ইত্যাকার মন্তব্য ও আশীর্বাদ ক'রে হাসতে হাসতে নিজের কাজে চ'লে গেল। এক টুকরো মেঘের আড়াল পেরিয়ে যেতে দেরি হ'ল না।

বউটার কথা ভেবে দুঃখিত হই। গোবরা যদি শোনে, 'ব্যালফুল' তার পতিভক্তির চরম পুরস্কার পাবে। মাছের ঝোল খাই না, কারণ জোটে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, ও-জিনিস জীবনে আর স্পর্শও করব না। মুখ নামিয়ে সামনের খোলা খাতাটার লাইনগুলোর ওপর নির্লিপ্তভাবে চেয়ে থাকি।

এই দুটো দিন ধ'রে সত্যিই আমার ঘাড়ে ভূত চেপেছে। মস্ত একটা কবিতা লিখে ফেলেছি—শুষ্কং কাষ্ঠং। গোড়াটা এই—

> হে ভারতি, তোমায় পুনর্বার
> সইতে হবে আমার অত্যাচার!
> তোমার কৃপায় গেয়েছিলাম আগে
> হৃদয় ভ'রে মনের অনুরাগে,
> শুষ্ক সরস খেজুরগাছের গান—
> রাখব এবার শুকনো কাঠের মান!

আমার খেজুরগাছের গান সাহিত্যে সমাদর পেয়েছে। মাছের দামের কথা এখন আর বলা চলে না। ব্যাপারটা মূল্য দিয়ে ক্ষতিপূরণের বাইরে চ'লে গেছে। কবিতাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করি। এক জায়গায় ছিল—

শুক্‌নো কাঠের খোল না হ'লে তবলা বাজে না,
কঠিন পিতল নইলে রে ভাই নূপুর গাজে না!
ছন্দশাস্ত্রের শুষ্ক সূত্র
নিয়ে, বাণীর বরপুত্র
কাব্য রচেন,—ছন্দ বিনে পদ্য সাজে না।

মাঝের দুটো ছত্র খটমটে ব'লে মনে হ'ল। পরিবর্তনের চেষ্টা করি। ব্যালফুলের সম্বন্ধে সরিকে সাবধান ক'রে দেওয়া উচিত ছিল, গোবরাকে যেন না বলে। কিন্তু না, তার পারিবারিক বিষয় তারই বিবেচনার উপর নির্ভর করে। পরে ভেবে দেখলাম, লাইন দুটোর সংশোধন অনাবশ্যক। ওটা কিছু না। আমার দাঁত নেই, তাই উচ্চারণে কষ্ট হচ্ছে। যারা দস্তুর তারা ঠিক ম্যানেজ ক'রে নেবে। সরি বোধ হয় এখনও আপন মনে হাসছে। নীচের অংশটুকু কিন্তু বেশ সহজবোধ্য হয়েছে—

বর্তমানের দানে মোদের হৃদয় পরবশ—
কেমন ক'রে বুঝব মোরা শুক্‌নো কাঠের রস?
শুষ্ক কাষ্ঠে শয্যা পাতি
সুখনিদ্রায় কাটাই রাতি
লেপ-তোশকের বন্দনা গাই—গাই না খাটের যশ!

কবিতাটা এখনও অসম্পূর্ণ। বউটা কি ভাববে? ভাববে, আমার

জন্যে তার এই নির্ধাতন। কবিতাটির প্রতিপাদ্য বিষয় হবেঃ মানুষ আজও গাছের ডালের মায়া পরিত্যাগ করতে পারে নি। বসতে পিঁড়ি, বেঞ্চি, চেয়ার; শুতে খাট, কৌচ, সোফা ইত্যাদি; এমন কি, ভদ্রভাবে টিকিট কেটে কলকাতা থেকে বম্বে যাবেন—গাছের ডালে দুলতে দুলতে। নদী এবং সমুদ্রবক্ষে পাড়ি দিতে গাছের ডালই জলে ভাসায়।…গোবরাকে ডেকে ধমকে দিতে হবে—তুচ্ছ দুটো কইমাছের জন্য স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা—হুঁঃ! নিশ্চয় সে লজ্জিত হবে, এর বেশি আর কি করতে পারা যায়? লেখাটা বরং শেষ ক'রে ফেলা যাক।

চারটি যুগের সভ্যতা আর বর্বরতার জোরে
এই পৃথিবীর মানুষ প্রভু।…

বাইরে হাওয়া-গাড়ির হর্ন। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি, গাড়ির ভিতর পূর্ণিমা, পাতাবাহার এবং অমাবস্যা গদি-আঁটা গাছের ডালে ব'সে।

অভ্যর্থনা করতে বেরিয়ে যাই। প্রথমে নামল অমাবস্যা, তার পর পাতাবাহার, সর্বশেষে পূর্ণিমা।

অবতরণকালে পূর্ণিমার একপাটি চটি রাস্তায় ছিট্‌কিয়ে পড়ল। কিশোর তা কুড়িয়ে এনে মোটরের পাদানিতে রাখলে।

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে পূর্ণিমা বললে, থ্যাঙ্ক ইউ। যেন ওর চটি কুড়িয়ে দেওয়া কিশোরেরই ডিউটি ছিল। থ্যাঙ্কস্‌টা কেবল এটিকেটের খাতিরে।

পূর্ণিমার হাতে একটা ফুলের তোড়া ছিল—গোলাপ ফুল। মাটিতে পা দিতেই সেটা হাত থেকে প'ড়ে গেল। কিশোর তুলে দিলে।

পূর্ণিমা বললে, থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার সেন।

দু পা এগিয়ে আসতে দেখা গেল, মোটরের মাডগার্ডের খোঁচায় ওর কাপড় আটকে গেছে। ছিঁড়েও গেল একটু। কিশোর সেটা ছাড়িয়ে দিলে।

কিন্তু তার মায়ের মুখের পানে চেয়ে এবার আর থ্যাঙ্কস দেওয়া হ'ল না। অনুর চোখে সে এমন একটা দৃষ্টি দেখতে পেলে; যাকে অব্যক্ত মাতৃস্নেহ ব'লে ভুল করবার কারণ ছিল না কিছু।

ওরা এসে বসল। আমার টেবিলের সম্মুখে অনু, এক ধারে কিশোর আর এক পাশে পূর্ণিমা। কিশোর-পূর্ণিমার বেশভূষার পরিবর্তন লক্ষিত হ'ল।

কিশোর পরেছে সাদা খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে সাধারণ স্যাণ্ডেল। আমার ধারণা হ'ল, এই জিনিসটা ভেবে চিন্তে করা হয়েছে। ব্যাপারটা তুচ্ছ, কিন্তু এর ভিতরে আমার প্রতি তার সম্মান-বোধটুকু ধরা প'ড়ে যায়। শুধু এই কারণেই ওকে আমি সম্মানিত অতিথি ব'লে স্বীকার ক'রে ফেলি।

পূর্ণিমার ছিল রঙিন শাড়ি, রঙিন জামা ইত্যাদি। না, রঙিন জিনিসে ওর অরুচি হয় নি। আসলে এই সব বিষয়ে আজও সে পরাধীন।

বউটার কথা মনে পড়ল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একখানা রঙিন শাড়ি ওর পিঠের ব্যথা ভুলিয়ে দিতে পারে। গিন্নীর কথা ভাবতে ভালো লাগে না।

অনুর বেশভূষা অপরিবর্তনীয়—সাদা থান, সাদা শেমিজ, পা খালি।

বললাম, তোমরা সব আস যাও, আমি কিছু করতে পারি না। এমনি লক্ষ্মীছাড়া আমি। একটু চা ক'রে দি?—স্টোভটার দিকে তাকাই। তার আশেপাশে চায়ের সরঞ্জাম।

অনু—আপনি করবেন?

আমি—নিজের জন্যেই করতে হয়। তাও দু-একবার নয়, দিনে পঁচিশ বার।

পূর্ণিমা—পঁ-চি-শ-বা-র! রোজ পঁচিশ কাপ চা খান আপনি? বাপ্‌স্‌!

এই অভদ্র কথাটা ও কোথায় শিখলে? ইস্কুলে হবে। পরক্ষণেই ওর মার চোখে চোখ পড়ল। মুখ নামিয়ে ব'সে রইল।

অনু—আর খাওয়াদাওয়া?

খাওদাওয়ার প্রোগ্রামখানা প্রকাশ ক'রে কিসের আশায় তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। আশা পূর্ণ হ'ল। তার চোখের পাতা দুটি রোদে-ঝল্‌সানো নীল অপরাজিতার মত নেতিয়ে পড়ল।

বার্ধক্যের শ্রেষ্ঠ অবদান—মেয়েদের চোখে চোখ রেখে কথা কইতে পারি। বার্ধক্যই সবচেয়ে ভাল, যদি জরা না থাকে এবং কিছুদিন বেঁচে থাকবার গ্যারাণ্টি পাওয়া যায়।

সরলা চা করতে জানে না। শিখিয়ে নিতে হবে। খাবার জল এগিয়ে দিতে যখন আপত্তি নেই, এতেও থাকবে না। জল নারায়ণ। অগ্নিস্পৃষ্ট হয়ে দ্বিগুণ শুদ্ধ। দুগ্ধ গোমাতার দান। শর্করা দেবভোগ্য। চা তো শুধু গাছের পাতা। অতএব দেখা যাচ্ছে, পঁচিশ কাপ চা-ও পরকালের কণ্টক নয়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে অনু ধীরে ধীরে স্টোভের কাছে গেল। কিশোর গাছের ডালে চুপ ক'রে ব'সে রইল। পূর্ণিমা দুলতে থাকে।

বাধা দিলাম না। দুটি স্নেহকোমল হাতের তৈরি চা, এ আমার স্মরণাতীত। মনে ভারি ফুর্তি হ'ল। নতুন একটা চুরুট ধরাই।

পূর্ণিমা—আর চুরুট? চুরুট কটা খান রোজ?

দৈনিক এক বাক্স। পঞ্চাশটা থাকে।

ইস্‌স্‌!—শেষের অক্ষরটা টেবিলময় ছড়িয়ে পড়ে।

চা তৈরি করতে করতে অনু বললে, তোমার অতশত দরকার কি বাপু! চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পার না?

এবার কিন্তু শাসনের সঙ্গে স্নেহ মিশ্রিত ছিল। সাহস পেয়ে বলি, দরকার আছে বইকি। এখন থেকে সাবধান হচ্ছে। পঞ্চাশটা চুরুট আর পঁচিশ কাপ চা-সমেত কোনও ভূত যদি ওর ঘাড়ে চাপে?

বেঁচে যাই। গঙ্গাস্নান ক'রে আসি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তবে বয়েসটা বাদ দিয়ে।

তাই ভাল! আমি তো আশান্বিত হয়ে উঠেছিলাম।

এসব হেঁয়ালির অর্থ কিছু বুঝলে না পূর্ণিমা। বুঝলে লজ্জিত হ'ত। শুধু ফ্যালফ্যাল ক'রে আমার পানে চেয়ে রইল। লজ্জিত হ'ল কিশোর।

প্রথম দর্শনে ভেবেছিলাম, ছেলেটা ভারি লাজুক। মোটেই না। কবিতা শোনাতে রাস্তার লোক ধরে, বিলাত-ফেরত অপরিচিত বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটারিতে ধাওয়া করে। কিন্তু আমাদের কথায় ওর লজ্জা পাবার কোনও কারণই ছিল না, ওর বিষয়ে কোনও কথাই হয় নি। ও কেন মুখ নামিয়ে রইল, চোঁখ তুলে অনেকক্ষণ চাইতে পারলে না। আমার নিজের মনকে শুধোই, কেন? কেন? কেন? কুসুমে কীট প্রবেশ করেছে কি?

চা এসে হাজির হ'ল। আমি বললাম, কিন্তু খাবার? খাবার যে কিছু নেই।

অনু বললে, খাবার কি হবে? আমি তো খাবই না, চা-ও না। যখন তখন খাই না আমি। আপনিও খাবেন না নিশ্চয়। পূর্ণিমাকে

দেখিয়ে বললে, ও তো খেয়েই আসছে। বাকি থাকে কিশোর। ওকে অবিশ্যি রাস্তা থেকে তুলে এনেছি।

অসহায়ভাবে সরলাকে চেঁচিয়ে ডাকি। ভিতর থেকে সরলা জবাব দিলে, যাই বাবা।

বাইরের লোকের কাছে এই সম্বোধন সে কোনও দিনই করে নি। হয় সে ওদের আগমন-সংবাদ জানে না, কিংবা নারীজাতিকে সমীহ করা দরকার মনে করে না। এও হতে পারে, বহুপরিচয়ের ফলে দ্বিধা-সংকোচ কেটে গিয়ে ক্রমেই তার সাহস বেড়ে যাচ্ছে।

আমার তাতে আপত্তি নেই। কেনই বা থাকবে? কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না। কোন্ দিক থেকে উপন্যাসের প্রকৃত উপকরণ জুটবে, আজও আমার জানা নেই।

কিশোর বললে, যদি কিছু মনে না করেন স্যার—

ছুটে গিয়ে কিনে আনবে? ধন্যবাদ। সে-ই ভাল।—এই ব'লে পকেটে হাত পুরি।

তা নয় স্যার, খাবার আমার সঙ্গেই আছে। এবং তৎক্ষণাৎ বিজয়গর্বে উঠে দাঁড়িয়ে দুখানা প্লেট মুছে নিয়ে, পকেট থেকে মুঠো ভ'রে বের করতে থাকে—ওর দু পকেট ভর্তি মুড়ি। দুটো পকেটেরই অন্তঃসারপূর্ণ স্ফীতি আমার নজরে পড়ল। মুড়িপূর্ণ একটা প্লেট এগিয়ে দিলে পূর্ণিমার দিকে, আর একটা নিজে নিলে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা না ক'রে একমুঠো মুড়ি তুলে পূর্ণিমা গালে পুরে দিলে।

হাতের কাজ সেরে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সরলার প্রবেশ। তাকে দেখে কিশোর বললে, কিছু দরকার নেই। তুমি যেতে পার।

পূর্ণিমা বললে, নিশ্চয়। চমৎকার মুড়ি! খুব ভাল লাগছে।

অগত্যা সরলাকে লক্ষ্য ক'রে বলি, ও-বেলায় গোবরাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। ঘাড় নেড়ে সরি চ'লে গেল।

অন্নুর শাসন-কঠোর মুখে এই প্রথম আমি স্মিতহাস্যের রেখা দেখতে পাই। সকৌতুকে কিশোরকে শুধোই, খাবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে বেড়াও নাকি?

হ্যাঁ স্যার। আমার একটা রোগ আছে, পথে পথে ঘোরা। ঘুরতে ঘুরতে খিদে পায়। বিস্কুট বেশি খাওয়া যায় না, জিব জড়িয়ে আসে, চোয়াল ধরে। অন্য খাবারে পকেট নোংরা হয়। আমার মত ভ্রাম্যমানের পক্ষে মুড়ির চেয়ে ডিসেণ্ট কিছুই নেই—সস্তাও। পিপাসা পেলে কলের জল।

প্রথম পরিচয়ে দেখেছিলাম, যে সাজে কখনও কেহ সাজে নাই।

আজ দেখা গেল, যে কাজ কখনও কেহ করে নাই।

দেখাই যাক, শেষ পর্যন্ত কিসে দাঁড়ায়। তবে স্বভাব-কবি একে বলতেই হবে। এর তুলনায় পথের ধারের ঘর অবাস্তব ও অস্বাভাবিক। প্রকাশ্যে বলি, কবিতা কখন লেখ?

চোখ নামিয়ে নিলে। বুঝলাম, এই ওর স্বভাব। সহজ গতিতে এগিয়ে আসে, হাত বাড়ালেই পিছিয়ে যায়। নূতন আর্টিস্টের এই সঙ্কোচ উপভোগ্য হ'লেও আত্মপ্রকাশের পক্ষে কত বড় অন্তরায়! বিশেষ ক'রে এমন একটা যুগে, যখন নির্লজ্জ তদ্বিরের ওপরেই নির্ভর করে সব কিছু ভবিষ্যৎ। নববধূর লজ্জার মাধুর্য যে বোঝে না, এ-হেন ডানপিটের হাতে প'ড়ে কত নারী-জীবন যে দুঃখের কাহিনীতে পরিণত হয়েছে, কে বলতে পারে? ফের খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, এসব কাজ কি পথে পথেই চলে নাকি?

সলজ্জ হাসি হেসে, চোখ না তুলেই বললে, একরকম তাই স্যার।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে কবিতা লেখ ?

আমি কবিতা লিখি না। মনে মনে রচনা ক'রে মুখস্থ ক'রে ফেলি। তার পর লিখে ফেলতে দেরি হয় না মোটেই। ছবিও তাই।

ছবিও আঁকো নাকি ? দেখি নি তো, ছবিও বুঝি মনে মনে আঁকো ?

এবার চোখ তুলে হেসে বললে, হ্যাঁ স্যার। মনে মনে ঠিক হয়ে গেলে আঁকতে সময় লাগে না। একটাতে কলমের আঁচড়, অন্যটাতে তুলির পরশ। এই সব কাজ রাত্রে চলে।

বুঝলাম, ভাষার অক্ষরের মত ছবির রেখাও তার হাতে সমান ভাবে ধরা দিয়েছে। যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথাই ওঠে না, দক্ষতা পরের কথা। ছবির বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হঠাৎ যেন সে শিউরে উঠল। হায় হায়, এতক্ষণ ধ'রে কি অসার গল্পে আত্মনিয়োগ ক'রেছিল এক পরলোক-প্রয়াসী বৃদ্ধের সঙ্গে, অথচ তার ইহলোকের সকল আশাই নির্মূল হতে বসেছে! অনুতপ্ত হৃদয়ে সে লক্ষ্য করলে, পূর্ণিমার প্লেট অনেক আগেই উজাড় হয়ে গেছে এবং সে লুব্ধদৃষ্টিতে কিশোরের প্লেটটার দিকে চেয়ে রয়েছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে হাত ধুয়ে নিলে। তার পর সাবধানে রুমালে হাত মুছে (বুক পকেটে রুমাল ছিল—মুড়ি ছিল না) পকেট থেকে মুড়ি বের ক'রে পূর্ণিমার প্লেটে রাখতে শুরু করতেই—

পূর্ণিমা বললে, থ্যাঙ্ক্‌স।

বোঝা গেল, ডক্টর রায়ের পারিবারিক প্রভাবে মুড়ি-মিলন পূর্ণিমার ভাগ্যে কচিৎ ঘটে। হয়তো মোটেই জোটে না।

কটমট চেয়ে অনু বললে, রাক্ষসের মত গিলছ যে, ভাত খেতে হবে না ?

অনু যেন কেমন! ভদ্রমহিলার সম্মান জানে না! অথচ কিছু

বলবার জো নেই। আমার ভাবী উপন্যাসের উপকরণ স্বরূপে যতগুলি চরিত্রের আজ পর্যন্ত সাক্ষাৎ পেয়েছি, অনুকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি! সরিকে আমি সকল কথা বলতে পারি—অবশ্য ধমক দেওয়ার উপায় নেই, কারণ কেঁদে ফেলবে। অতসীকেও ভৎর্সনা করতে পারি। আমি জানি, আমার তিরস্কার সে অবনতমস্তকে গ্রহণ করবে, আমার কথা মেনে চলবে। আমার ভয় হয়, পূর্ণিমার সঙ্গে একত্র ক'রে যে কোনও কারণে বা অকারণে অনু যেন আমাকেও ব'কে দিতে পারে। ওর এক হাতে মাতার স্নেহস্পর্শ, অন্য হাতে পিতার শাসন-দণ্ড।

কিন্তু ততক্ষণে সুললিত শব্দবিন্যাসে মুড়ি-কাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়ে গেছে। কাব্যপাঠে পূর্ণিমার ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখে পুলকিত হই। শুধু দু-একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে কিশোরের পানে চেয়ে ছিল। বেশ মচমচে মুড়ি। ওদের খাওয়ার শব্দ ক্রমেই আমাকে নিশ্চিন্ত ক'রে তোলে—এরাই আমার শুষ্কং কাষ্ঠং প্রভৃতি দন্তদমন-কাব্যের প্রকৃত পাঠক। এই কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল—

এবং মনে পড়তেই অনুকে শুধোই, তোমাদের সঙ্গে মিসেস রায় এলেন না যে? 'নন্দিনী'কে নিয়ে এখনও খুব ব্যস্ত নাকি?

অনু বললে, না, তবে ক্লান্ত খুবই। যা খাটতে হয়েছে এই কদিন! 'নন্দিনী' বেরিয়ে গেছে।

বেরিয়ে গেছে? কবে?

জবাব দিলে কিশোর। এতক্ষণে তাদের খাওয়া শেষ হয়েছে। দু পকেটে কত কটা মুড়িই বা ধরে! বললে, গত সোমবারের আগের সোমবার। আপনার জন্যে এক কপি পাঠিয়েছেন। গাড়িতেই প'ড়ে আছে। নিয়ে আসি।

এখন থাক্। যাবার সময় দিয়ে যেও। কে পাঠিয়েছেন?

বিভূতিবাবু।—আমার চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখে বললে, বিভূতিবাবু—'নন্দিনী'র কর্মসচিব।

মনটা দ'মে গেল। প্রায় দুই সপ্তাহ হ'ল 'নন্দিনী' বেরিয়েছে, অথচ আমি তার কিছুই জানি না। প্রথম সংখ্যা পাওয়া গেল, কর্মসচিবের কাছ থেকে, কিশোরের মারফত—অর্থাৎ নিতান্ত সরকারী ভাবে, এবং এ বিষয়ে অতসী নীরব! আমার মনে এক আবাল্য-পুষ্ট চিরন্তন শিশু অভিমানের রূপ ধ'রে ঘাড় বেঁকিয়ে ব'সে রইল।

আত্মগোপন ক'রে বললাম, তোমরা আর চা খাবে? আর একবার হোক না।

কিশোর সজোরে ঘাড় নাড়লে। পূর্ণিমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললে, নো স্যার, থ্যাঙ্কস্।

'নন্দিনী'খানা গাড়ি থেকে এনে আমার টেবিলে নামিয়ে রেখে ওরা বিদায় নিলে। আমি চুপ ক'রে রইলাম। পত্রিকাখানা খুলে দেখতেও কৌতূহল হ'ল না।

১২

কিশোর অন্তু পূর্ণিমা যখন চ'লে গেল, তখন বেলা বারোটা। সরিকে ডেকে বললাম, খিদে নেই। সে কিছু বললে না। সম্ভবত তার ধারণা হয়েছিল, সকালের চায়ের মজলিসে অনেক কিছু খাবার এসেছিল এবং আমি নিজেও তাতে অংশগ্রহণ করেছি। স্বযত্নকৃত এক পেয়ালা চা খেয়ে শয্যাগ্রহণ করি। দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত ছিলাম না, তবু কোন কোন দিন ঘুমিয়ে পড়তাম। আজও ঘুমিয়ে পড়ি।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। বৈকালে ঘুম থেকে উঠে অনেকটা সুস্থ বোধ করি। বুঝতে পারি, আমার মনের ক্ষত থেকে বেশ একটু রক্ত ঝরেছে। বৃদ্ধবয়সের রক্তাল্পতায় এই ক্ষরণ সহ্য করিবার শক্তি আমার ছিল না। হতে পারে মন জিনিষটা এই বয়সে খুব শক্ত হয়ে যায়, রৌদ্রে বৃষ্টিতে ভিজে তেতে জমাট বেঁধে যায়, স'য়ে স'য়ে আঘাত সইবার শক্তি বাড়ে।

আমি এক অতিবৃদ্ধাকে দেখেছিলাম। সকালবেলায় তার পুত্রের মৃত্যু হ'ল, বুক চাপড়ে কাঁদলে খানিক, চোখে জল দেখা গেল না। আশ্চর্য, সন্ধ্যাবেলায় আহার্যদ্রব্যের ভাগাভাগি নিয়ে নাতি-নাতনীদের সঙ্গে ঝগড়া করছে বুড়ী!

ভগবান আমাকে রক্ষা করুন, তত দিন যেন আমি বেঁচে থাকি না।

আমার মনের গায়ে কোনও একটা জায়গা পূর্বক্ষতের দরুণ দুর্ব্বল ছিল, তুচ্ছ আঘাতেই ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যাই হোক, চিকিৎসার দরকার হয় নি, ভাল ধাত্রীর হাতে প'ড়ে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে।

সর্ব্বক্ষতের শুশ্রূষাকারিণী জগদ্ধাত্রী নিদ্রা, তোমাকে নমস্কার!

আমার ছোট বন্ধুদের চরিত্র ভাল নয়। সামান্য কারণেই অভিমানে গাল ফুলিয়ে বসে। অন্তরঙ্গ মেলামেশার ফলে তাদের চরিত্রের প্রভাব আমার উপরে পড়েছে কি? ঘটনাটা তুচ্ছ। অচিন পাখি বটবৃক্ষের নূতন নীড়কে অবহেলা ক'রে পাশ কাটিয়ে উড়ে চ'লে গেছে। এখন থেকে সাবধান হতে হবে।

চেষ্টা ক'রে চাঙ্গা হয়ে ব'সে এটা ওটা সেটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খেলা করি। চশমাটা মুছে ফেলি। ফাউণ্টেন-পেনটায় কালি ভ'রে সেই কালিটা ফেলে দিয়ে পেনটাকে খুলে ফেলে ধুয়ে মুছে আবার

তাতে কালি ভরি। একটা চুরুট ধরাই। নিজের তৈরি এক কাপ চা। তার পর চুরুটের বদলে সিগারেট। আমার নাম-ঠিকানা লেখা প্যাকিং পেপারে মোড়ক করা 'নন্দিনী'খানা তুলে নিয়ে আবার তা নামিয়ে রাখি। সিগারেটের গন্ধ বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। আবার একটা চুরুট। 'শুষ্কং কাষ্ঠং' কবিতাটায় চোখ বুলিয়ে যাই।

এমন সময় রিকৃশ নিয়ে গোবরা এল। তাকে পাঠিয়ে দিতে সরিকে বলেছিলাম, রিকৃশ আনতে বলি নি। ভাবলাম, ভালই হ'ল। বেশ পরিবর্তন না ক'রে এবং চটি প'রেই রিকৃশয় উঠে চালককে নির্দেশ দিলাম, বাজার। বাজার থেকে শিবতলা। শিবতলা থেকে মাঠ। মাঠ থেকে শালবন। শালবন থেকে কলেজ। কলেজ থেকে নতুন ইস্কুল। বাজারেও কিছু কাজ ছিল না, নিছক ভ্রমণই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

ঠিক সন্ধ্যায় বাসায় ফিরি। দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে দেহমন বেশ প্রফুল্ল। বৈকালের দিকে আকাশে কিছু মেঘ ছিল। গুমট কেটে গিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। আশেপাশে বৃষ্টি হয়েছে। অসমাপ্ত কবিতাটা আজ শেষ করতে হবে। 'শুষ্কং কাষ্ঠং'।

রিকৃশ থেকে নেমে একখানি দশ টাকার নোট গোবরার হাতে গুঁজে দিলাম। নোটটা ফিরিয়ে দিতে দিতে গোবরা বললে, ভাড়া লিতে মা মানা করেছে। নোটটা খুলে দেখে সবিস্ময়ে বললে, দশ টাকা যে!

মুখে রুষ্টভাব এনে জিজ্ঞাসা করি, বউকে মেরেছিলি?

এক ঘণ্টা তার রিকৃশয় ছিলাম, একটিও কথা বলি নি। বরাবর গম্ভীর।

লজ্জিত না হয়ে ঘাড় নেড়ে সে স্বীকার করলে, হাঁ, মেরেছিল।

কেন ?

আমাদের ঘরের কথা আপনি বুইতে লারবেন স্যার্, মাঝে মাঝে ধোলাই না দিলে ইস্ত্রিলোক দোরস্ত থাকে না।

বটে! এর পর যদি শুনতে পাই, তোমাকে আমি তুরস্ত করব, বুঝলে? টাকা দশটা নিয়ে যা, জামাকাপড় কিনে 'বউকে দিবি—রঙিন শাড়ি। বুঝলি ?

লারব, স্যার্। আপনারও তো লাতবউ ব্যাটে, আপনি দিয়েন। আমি লারব।—এই ব'লে নোটখানা আমার টেবিলে নামিয়ে রেখে রাগ ক'রে সে চ'লে গেল।

তার পৌরুষে আঘাত করা হয়েছে। কালকে 'ধোলাই' করে, আজ যদি নিজে হাতে শাড়ি কিনে দেয়, বউ তার ঘাড়ে চড়বে—এই তার শঙ্কা। শেষ পর্য্যন্ত সামলাবে কেমন ক'রে?

লারব স্যার্—'লারব' তার মাতৃভাষা, রিকৃশ-চালকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় 'স্যার্'টা তার অভিজাত-সম্প্রদায়ের সৎ-সংসর্গের ফল।

একটা বিষয়ে সে আমাকে নিশ্চিন্ত করেছে। তার মহত্ত্বে আমি খুসি হয়েছি। তার বউকে শাড়ি উপহার দেওয়ার অধিকার পাওয়া গেছে। কবিতাটায় মন দিতে পারব। আহা, আমার জন্যে সে মার খেয়েছে! পায়ের তলায় কাঁটা বিঁধলে যেমন হয়, মন যেন তেমনই ঠিক চলতে পারছিল না।

সরি এতক্ষণ বাড়িতে ছিল না। দরজায় তালা বন্ধ ছিল। আগেই বলেছি, দরজায় তুটো চাবি, একটা আমার কাছে থাকে, আর একটা তার কাছে। হঠাৎ ঝড়ের মত এসে টেবিল ঝেড়ে আলোটা রেখে সে চ'লে গেল। এই তার শেষ নিত্যকর্ম্ম।

কবিতার খাতাখানা খুলে বসি। উজ্জ্বল আলোয় তার অক্ষরগুলো

আমার চোখে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। উৎসাহিত হয়ে লিখতে শুরু করি—

মহারাজ বিক্রমাদিত্য, উজ্জয়িনীর পথে,
সঙ্গে নিয়ে দুজন কবি, যাচ্ছেন চ'ড়ে রথে।
এক ধারে তাঁর ব'সে আছেন অমর কালিদাস।
কাব্য-কমল-কাননচারী নিত্য মধুমাস!
অপর পাশে বররুচি—

একমনে লিখছি, এমন সময়—

তা তা তা দ্‌দাঃ

মৃদু মৃদু করতালির সঙ্গে উক্তরূপ অনির্বচনীয় মধুর কাকলিতে আকৃষ্ট হয়ে চোখ তুলে দেখি, থপ থপ ক'রে আমার দিকে হেঁটে আসছে একটা কালো-কোলো নাদুস-নুদুস ছেলে, সবে ডানা বেরিয়েছে—মানে, হাঁটতে শিখেছে।

পথ খুব অন্ধকার ছিল না, কিন্তু যে কোনও পথ তার পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। আমার ঘরে আলো দেখে এবং দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে।

বেশ ছেলেটি, দেখতে ঠিক গোপালের মত। কিন্তু এই সাঁঝের আঁধারে মা-যশোদার কোল আঁধার ক'রে আমার ঘরে কেন? "শুষ্কং কাষ্ঠং" ছেড়ে কবি-রবির 'শিশু' কাব্যে মন চ'লে গেল—

তোমার কটিতটের ধটী কে দিল রাঙিয়া?
কোমল গায়ে দিল পরায়ে রঙিন আঙিয়া!

তার পর একটু পরিবর্তন ক'রে নিলেই কবিতাটি খাপে খাপে মিলবে—

সাঁঝের বেলা আমার ঘরে,
এলে যে তুমি কী মনে ক'রে!
চরণ দুটি চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিয়া।

গায়ে রঙিন জামার উপর রঙিন সোয়েটার, পায়ে বিচিত্র মোজা, কিন্তু জুতো নেই, এবং—এতক্ষণ আমি খেয়ালই করি নি যে—কটিতটও ধটীহীন! এই অর্ধ-দিগম্বরকে পেয়ে খুশি হতে যাচ্ছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার বিপদ বুঝতে পারি। বাইরে বেরিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। আমার নিকট-প্রতিবেশী উকিল-পরিবারের সব কিছু খুঁটিনাটি আমার জানা, ও-বাড়িতে এই বয়সের ছেলে একটিও নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তবু কেউ ওকে দাবি করতে এল না। নিশ্চয় ও আনমনে খেলা করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

তা হ'লে এখন আমার কর্তব্য দাঁড়ায়, ওকে কাঁধে ক'রে পাড়াময় শুধিয়ে বেড়াই—হ্যাঁ গো, তোমাদের কারও ছেলে হারিয়েছে? আচ্ছা, এমন বিপদে কেউ কখনও পড়েছেন? তা ছাড়া, ভেবে দেখুন, আমি খুঁজে বেড়াব তাদের—তাদের ছেলের অধিকারী-হিসাবে, আর তারা বেড়াবে আমার খোঁজে—তাদের ছেলের উত্তরাধিকার-সূত্রে! তার চেয়ে ও এইখানেই থাক্ কিছুক্ষণ। খানিক পরে কেউ না কেউ এসে পড়তে পারে। পারে কেন, নিশ্চয় আসবে। ও কিছু ওর অক্ষম পা দুটোকে নিয়ে এক মাইল দূর থেকে চ'লে আসে নি!

আমাকে চিন্তিত দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল। হুকুমের ভাবে বললে, এন্‌নেঃ! অর্থাৎ, আমাকে তুলে নিয়ে হয় কোলে ক'রে ব'সে থাক না হয় আমাকে টেবিলের ওপর বসিয়ে দাও।

আমার দুর্বুদ্ধি, আমি শেষোক্তটাই সুবিধা মনে করি।

টেবিলের উপর নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে আমার বন্ধুত্বে পরম প্রীত হয়ে আত্মীয়তা স্থাপন করলে, দাদ্‌দাঃ।

তা না হয় হ'ল, কিন্তু কি করা যায় ওকে নিয়ে? 'আপৎকালে হুপস্থিতে'—বিপদ যখন ঝুপ ক'রে এসে উপস্থিত হয়, তখন বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে হয়। আমার টেবিলের জিনিসপত্র সব নামিয়ে রাখতে চাই।

আপত্তি জানিয়ে বললে, মাবুব। অর্থাৎ, এই সবই আমার লক্ষ্য ছিল—তুমি নয়; এখন যদি না দিতে চাও, যুদ্ধ কর।

ততক্ষণে আমি সব কিছু নামিয়ে ফেলেছি মেঝের উপর। ছলছল-চোখে হাত মুঠো ক'রে ও আক্রমণের চেষ্টা করলে। তাতে ব্যর্থকাম হয়ে হাঁ ক'রে এবং তারস্বরে কেঁদে উঠল।

আমার ভয় হ'ল। কল্পনানেত্রে দেখি, ওর বদনবিবরে কৌরবসৈন্য পাণ্ডবসৈন্য ভীষ্ম-দ্রোণ-দুর্যোধন প্রভৃতি বীরবৃন্দ অবলীলাক্রমে ঢুকে পড়ছে। পরাজয় স্বীকার করি এবং অবনতমস্তকে তার খেলার জিনিস সব কুড়িয়ে দিতে থাকি। কেবল কৌশলে পিন-কুশানটা লুকিয়ে ফেলি।

খেলনাগুলি একত্র পেয়ে খুশি হয়ে বললে, তাদ্‌দাঃ!

অর্থাৎ সখে, তুমি আমার প্রিয়সখা, মদ্‌ভক্ত, মৎপরায়ণ এবং একান্ত আমারই শরণাগত। অতএব আমার সৌম্যমূর্তি অবলোকন কর।

আমার প্রিয় সাহিত্যিক-খেলনাগুলি গায়ের জোরে দখল ক'রে নিয়ে ও গম্ভীরভাবে খেলায় মন দিলে। এটা ওটা নাড়তে নাড়তে শেষে ফাউণ্টেন-পেনটা তুলে আস্বাদ গ্রহণ করলে।

এ দিকটা আমি মোটেই ভাবি নি। পাঁচরঙা কাচের কাগজ-চাপা ছিল, রূপোর সুদৃশ্য সিগার-কেস, দোরঙা লাল-নীল পেনসিল, চকচকে

চশমার খাপ, মার্বেল কাগজে বাঁধাই নোটবুক প্রভৃতি অবহেলা ক'রে বেছে নিলে ওই ঘোর কৃষ্ণ ব্ল্যাকবার্ড পেনটা! বোধ হয় ওর কৃত্রিম-স্বর্ণের ক্লিপটা দেখে ওর মনে সুবর্ণলোভী মানবশিশুর আদিম আকর্ষণ জেগে ওঠে। কলমের ভাগ্যে যাই থাক্, কিন্তু ওটা যে ওরই পক্ষে বিপজ্জনক। সর্ব্বনাশ! নিবটা যে খোলাই আছে! এগিয়ে গিয়ে কলমটায় হাত রেখে সানুনয়ে বলি, দাও তো খোকা, কলমটা আমায়। হ্যাঁ, কলমটা, তোমার হাতের ওই কলমটা শুধু। লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে, চাঁদ ছেলে। একটিবার দাও, এক্ষুনি ফিরিয়ে দোব। দাও তো দেখি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে, দিয়ে ফেল, হ্যাঁ।

কলমটাতে একটু টান পড়তেই সে তার অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হ'ল, ক্রন্দন। অর্থাৎ রাজী নয়। কেনই বা হবে! হিটলার যদি আমাদের বলত—দাও তো ভাই ভারতবর্ষটা আমাকে কিছুদিনের জন্যে, ওর মশা আর পোকা মেরে আবার তোমাদের ফিরিয়ে দেব, আমরা কি রাজী হতাম?

জোর ক'রে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই—

আবার, আবার সেই বিশ্বরূপের বিভীষিকা! আমার অন্তরাত্মা উচ্চ চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল, কে কোথায় আছ, রক্ষা কর।

না, আমার অবস্থাটা বুঝুন দয়া ক'রে। উনি নিব-খোলা কলমটা নিয়ে খেলা করবেন, আর আমাকে অর্জুনের লক্ষ্যবেধের মত একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে হবে, চোখের পলক ফেলতে পাব না, পাছে শ্রী-অঙ্গে আঘাত লাগে। অথচ দ্রৌপদী-লাভের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। মনে প'ড়ে গেল, সেই ভাঙা টিনের বাক্সটায় বহুদিনের পুরাতন একটা পিতলের বাঁশি ছিল। বিশ বছর আগে কিনেছিলাম, কিন্তু সুরসাধনায় কিছুমাত্র অগ্রসর হ'তে পারি নি।

কলমটা কেড়ে নিতেই ও চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। বাজিকরের সত্বরতায় বাক্স খুলে বাঁশিটা বের ক'রে ফেলি।

আপনাদের মনে থাকতে পারে, এ সেই বাক্সটা, যা নব-বিবাহিত পুতুল-দম্পতির 'লোহার বাসর-ঘর' স্বরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। পুতুল ছুটো পাশাপাশি এক ভাবেই শুয়ে ছিল, আমার হাতের নাড়াচাড়া পেয়ে একটুখানি বিচলিত হ'ল মাত্র।

বাঁশিতে ফুঁ দিতেই কান্না ছেড়ে হাত বাড়িয়ে বললে, দে-দে-দেঃ! তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করি। ওর মুখে হাসি, চোখে জল।

এতক্ষণে সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিণত হয়েছে এবং রাত্রি ক্রমেই গভীর রাত্রেই পরিণত হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। আমাকে আরও বেশি বেকায়দায় ফেলতে চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে এবং টিপিটিপি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকছিল, দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হই।

বাঁশিটার আওয়াজ মিষ্টি হ'লেও, আস্বাদন ভাল ছিল না। খানিক চুষে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

আমার বুক ঠেলে কান্না আসে। একটু পরেই ঘুম পেলে ও বলবে —মা দাবো। চেয়ে দেখি, তার মুখে চোখে সেই সুলক্ষণ পরিস্ফুট, ঘন ঘন চোখ কচলাচ্ছে। সারা রাত যদি কেউ না আসে? তখন আমার গতি কি হবে? এই সম্মুখ-সমর হতে কেমন ক'রে আমি রক্ষা পাই?

ভেবে দেখলাম, ওকে কোলে ক'রে বেরিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বরং এই বুদ্ধিটা গোড়ায় করলেই ভাল হ'ত। প্রথমে উকিল-গিন্নীর এবং পরে প্রয়োজন হ'লে সরিদের পাড়ায় গিয়ে লোকজনের সাহায্য নিতে হবে। কালবিলম্ব না ক'রে লণ্ঠন জেলে

ফেলি। ছাতা, লণ্ঠন, ছেলে—এই ত্রিবিধ অসহযোগী বস্তু একসঙ্গে বহন করবার প্রক্রিয়া বিষয়ে গবেষণা করছি, এমন সময় একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে আমার মুখ থেকে আপনা থেকে বেরিয়ে এল, হে বিপদ্‌তারণ মধুসূদন!

ভগবান আমার কথা স্বকর্ণে শুনলেন। জীবনে এই প্রথম আমি পরিচয় পাই, মনের আবেগে যে তাঁকে ডাকে, তার সে ডাক নিষ্ফল হয় না। বাইরে কে ডাকলে, ও মশাই, ঘরে আছেন? শুনছেন?

কে?

আমাদের খোকা এসেছে আপনার এখানে?—উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

এক লাফে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলি। হাঁটুতে টেবিলের ঠোকা লাগে, গ্রাহ্য করি না।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল আমারই খর্ব সংস্করণ—স্থূলদেহ, দেহাগ্রগামী দোদুল্যমান ভুঁড়ি, লোমশ বক্ষ, মাথায় টাক। আর একটু হ'লে আমার কপালে ও দরজাতে ঠোকাঠুকি লাগত। খোকাকে কোলে তুলে নিতেই খোকা তার মুখের দিকে চেয়ে সোল্লাসে ব'লে উঠল, দাদ্‌-দাঃ! ওর দাদুকে চিনে রাখতে একমাত্র অভিজ্ঞান ঠিক ক'রে রেখেছিল, মাথায় টাক যা আমারও আছে, আর যে সব পার্থক্য —একেবারে আকাশ-পাতাল, সে সব যেন কিছুই নয়!

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভদ্রলোক বললেন, বেশ লোক মশাই। আমরা ভাবি চুপচাপ থাকেন, করেন কি ভদ্রলোক! এখন দেখছি, চমৎকার ব্যবসা ফেঁদে ব'সে আছেন।

ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করি, গয়নাগাটি ছিল নাকি কিছু?

তা না হয় ছিল না, হ্যাঁ, স্বীকার করছি যে গয়না-টয়না কিছু ছিল না। কিন্তু ছেলেটা? ছেলেটা তো গাপ করতে বসেছিলেন? একটু দেরি হ'লেই হয়েছিল আর কি!

ইত্যবসরে তাঁর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে, ছেলের আর দুই ঠাকুরদা, বড় এবং মেজো, তার বাবা, জেঠা এবং আধ-ডজন কাকা—বড়, মেজো সেজো, ন, ফুল, ছোট, তার জেটতুতো ও খুড়তুতো দাদারা (সেই সব পরিচয় পরে জানতে পারি) এবং পূর্বোক্ত বয়স্ক লোকদের অধিকাংশ স্ত্রী-সংস্করণ, এবং অপিচ, পল্লীর বহু পুরুষ এবং নারী আমাকে ঘিরে ফেলে আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

আমি তাঁদের সকাতরে বুঝিয়ে বলি, আমার সহায়হীনতার কথা। ছেলে নিয়ে আমি কি করব, নাই তাই কোনও রকমে দিন চ'লে যাচ্ছে, আমার নিজেরই লালন-পালনের জন্যে অন্তত দু জোড়া বাপ মায়ের প্রয়োজন ইত্যাদি। কিন্তু এতে তাঁরা আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

ভদ্রলোক বললেন, বাজে বকছেন কেন মশাই! আমরা সব বুঝি, সব জানি। অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি। এই শহরে তিন পুরুষ বাস করছি। একটু রাত হ'লেই ছেলেধরাদের ডিপোয় চালান দিয়ে—বাস্, আর আপনাকে পায় কে? যে ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোক! যাক, আপনার সঙ্গে আমরা তর্ক করতে চাই না, অপমানও করব না। তা হ'লে এখন পুলিশ ডাকি, কেমন? আপনারই মত চাইছি, আপনিই বলুন, এরকম অবস্থায় আপনি কি করতেন?

এতক্ষণে আমার খেয়াল হ'ল যে, বাংলা দেশে সে-সময়ে ছেলেধরার জোর গুজব চলছে।

তাঁর ক্রোড়স্থিত সেই বালকরূপী নারায়ণ ভিন্ন আমার পক্ষে দ্বিতীয় সাক্ষী ছিল না। সে তখনও জেগে ছিল—বোধ হয় গোলমালে ঘুম হয় নি কিংবা হয়তো মজা দেখছিল। করুণদৃষ্টিতে তার দিকে চাইতেই, দৈবক্রমে তার চোখ আমার চোখে পড়ল। তার প্রকৃত দাদুর কোল

থেকে ঝুঁকে প'ড়ে বললে, দাদ্‌দাঃ!—আমার কাছে আসতে চায়! মহাবিপদে সামান্য একটু অবলম্বন পেয়ে আমার বুদ্ধি খুলে গেল। টেবিল থেকে বাঁশিটা তুলে নিয়ে খুব জোরে ফুঁ দিলাম।

ছেলেটা আরও বেশি ঝুঁকে প'ড়ে এবং বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে ওঠে। আমার মনে হ'ল, যেন আমি ছাড়া আর সকলেই শনৈঃ শনৈঃ ওর মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে। যিনি সঙ্কটের স্রষ্টা, তিনিই ত্রাণকর্তা।

সমধিক কুপিত এবং উত্যক্ত হয়ে ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এসে চোখ রাঙিয়ে বললেন, আবার তুক করা হচ্ছে! পাজী বদমাস কোথাকার!

ভিড় ঠেলে আমাদের দুজনের মাঝে এসে দাঁড়ান এক প্রৌঢ়া। মাথার চুল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত ছোট ক'রে ছাঁটা, মুখখানি গোলগাল, চোখ দুটো বড় বড়, গরুর চোখের মত ভাবলেশহীন, নাক চেপটা, সামনের দাঁত কিছু উঁচু, গায়ের রঙ—অমাবস্যার পরপারে কি থাকতে পারে আমার জানা নেই। বেশভূষায় সধবার লক্ষণ, তবে অত্যন্ত সাদাসিধে।

ভদ্রলোকের নাকের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে বললেন, তোমার কি বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে ছোটদা? বলি, ভীমরতি ধরেছে না-কি? কেন শুধু শুধু ভদ্রলোককে অপমান করছ? কষ্ট ক'রে আগলিয়ে রেখেছেন, তাই ছেলে পেয়েছ। দেখছ না, কেমন ভাব হয়েছে দুটিতে! দাও, ছেলে দাও ওঁর কোলে। বলে, পাড়াপড়শী মা-ষষ্ঠী। যার ছেলে তার ঘরের কোণ, পাড়াপড়শী আপনজন! অর্থাৎ, যার যার ছেলে নিজ নিজ রক্ষণাবেক্ষণে থাকে সত্য প্রতিবেশীরাই তাদের প্রকৃত রক্ষাকর্তা।

খোকা তখন আমার ওভারকোটের কলারটা খামচে ধরেছে।

ছেলেটাকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দ্বিতীয়বার আমি তাঁর করুণার স্পর্শ পাই।

কিন্তু-কিন্তু ভাবে ভদ্রলোক বললেন, তুই আমাকে বোকা বুঝিয়ে দিলি নগী! উনি তো বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারতেন ওকে? সামনে থেকে সব্ দেখি। তুই কি বুঝবি এসবের?

নগেন্দ্রবালা বললেন, বউয়ের কথা শুনে শুনে যেটুকু বুদ্ধি তোমার ছিল দাদা, তাও গেছে উবে। এইবার তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঠেকল ভদ্রলোকের নাকের ডগায়। তিনি নাক পিছিয়ে নিলেন। নগী বক্তৃতা ক'রে চলল, ছেলের গায়ে কি ঠিকানা লেখা ছিল যে, উনি পৌঁছে দেবেন? তোমরা খোঁজ ছেলে, আর উনি খুঁজুন তোমাদের, সারারাত তাঁত-বোনাবুনি চলুক আর! বিদ্বান লোক, তোমাদের মত তো থার্ড কেলাস বিছে নয়। দিনরাত্তির কাগজ-কলম আর বই নিয়ে থাকেন। আমি কিছু বুঝি না, আর ওঁরা বোঝেন সব!

আমার জীবনব্যাপী নিষ্ফল সাধনার এই প্রথম পুরস্কার।

নগীর গলায় গ্রামোফোনের রেকর্ড বেজে উঠল, কিছু খোঁজ রাখ তোমরা? এই যে ভদ্রলোক পাড়ায় এসে একলাটি বাস্ করছেন, একবার এসে খবর নিয়েছ কোনও দিন? এরই নাম পাড়াপড়শী, না? আমি তবু মাঝে মাঝে এসে উঁকি ঝুঁকি মেরে যাই। বলি, দেখি কেমন আছে ভদ্রলোক—মরেছে, না বেঁচে আছে!

আজ জানা গেল, আমার জীবন-মরণ-সমস্যা নিয়ে আমার পিছনে এতদিন ধ'রে স্পাই লেগেছিল। যাই হোক, ব্যাপারটার এই ভাবে নিষ্পত্তি হ'ল। আমার কোল থেকে নিদ্রিত খোকাকে তুলে নিয়ে ওরা সদলবলে চ'লে গেল। যাবার সময় আমার টেকো বন্ধুটি আর একবার আমার দিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে গেলেন।

পাড়ার লোকের সঙ্গে ব্যাপকভাবে এই আমার প্রথম পরিচয়।

শুষ্কং কাষ্ঠং প'ড়ে রইল। তা থাক্ ক্ষতি কিছু নেই। টাট্‌কা ফল ফুল প্রভৃতি কাঁচা মালের কারবার আমার নয়। শুকনো কাঠ যতই বেশি পুরনো হবে, ততই বেশি হালকা হবে, জ্বলবে ভাল, নিজেও আমি পুড়ব ভাল। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে!

কড়াপাকের এক কাপ চা তৈরি ক'রে নিয়ে কড়া চুরুট ধরিয়ে নিলাম। এক চুমুক চা এবং এক টান চুরুট যথাক্রমে চলতে থাকে— এককালীন ডুড ও টামুক! অন্যমনস্কভাবে কিন্তু খুশিমনে নন্দিনীর পাতা উলটিয়ে যেতে যেতে আলগোছে নজরে পড়ল—"আমাদের কথা (প্রতিবাদ)"

প্রথম সংখ্যাতেই প্রতিবাদ? আকৃষ্ট হয়ে প'ড়ে ফেলি। দেখা গেল, প্রতিবাদটি পূর্বকথিত সাহিত্যে দুর্নীতি বিষয়ে অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে। আর দেখা গেল না আমার লেখা গল্পটি। অথচ সম্পাদকের কোঠায় আমারই নাম ছাপা হয়েছে। বুঝলাম, এ স্বয়ং কর্মসচিব বিভূতিবাবুর কাজ।

তা হোক্, বহুদিন এ সবের অতীত হয়েছি। 'নন্দিনী' অধঃপাতে যাক। নবমীর নীরবতার কারণ বুঝতে পারি। আমার মনের চিরন্তন অভিমানী শিশুটি আমার পানে চেয়ে হেসে ফেললে।

শোবার আগে প্রার্থনা করি—যে বিপদে আজ পড়েছি হে অন্তর্যামী, এইরকম বিপদে যেন রোজ পড়ি, যাতে দিনান্তে অন্তত একবারও তোমার প্রিয়স্পর্শ আমার প্রাণে পাই।

১৩

আপনারা হয়তো আশ্চর্য হয়েছেন, এতবড় একটা আন্দোলনে উকিল পরিবারের তরফ থেকে কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া যায় নি। আমি নিজে মোটেই আশ্চর্য হই নি, কারণ, কারণটা আমার জানা ছিল। বিষয়টি অতি তুচ্ছ, কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ উপন্যাসের উপকরণ হিসাবে কাজে লাগতে পারে।

আমার ছোট বন্ধুরা আবার আমার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করেছে। এদের মধ্যে উকিলবাবুর বড় নাতি অরুণকুমার বয়োজ্যেষ্ঠ। একদিন সে আমার বসবার ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে, এদিক ওদিক চেয়ে সটান দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। তার মুখে চোখে গুপ্ত বিপ্লবীর সন্ত্রস্ততা। চোখ দুটো বড় বড় ক'রে চুপি চুপি বললে, দাদু, একটা কথা আছে।

তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হ'ল, তাদের বোমা তৈরির কারখানাটা পুলিসে ঘেরাও করেছে। কিন্তু সে যা বললে তার সারমর্ম এই: তাদের মুহুরীদাদা উকিলবাবু ও উকিলগিন্নীকে বুঝিয়েছে যে, আমার সংসর্গ সৎ-সংসর্গ নয়। আমি কোন্ জাত—ক্রিশ্চান, না, মুসলমান, জানা নেই। বাঙালী কি না, তারই বা ঠিক কি? তাঁর পরিচিত জনৈক ইংরেজ পাদ্রি ঠিক বাঙালীর মত বাংলা বলতে পারতেন মহুরীবাবু স্বকর্ণে শুনছেন। তাঁর মতে, এরূপ ক্ষেত্রে পারিবারিকভাবে এত বেশি মেলা-মেশা সঙ্গত নয়। অরুর কথাবার্তায় আরও জানতে পারি, তাঁর সৃষ্ট আন্দোলনটা আজ শুধু উকিল-পরিবারেই সীমাবদ্ধ নয়, পাড়াময় ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে, আমার সঙ্গে মেলামেশার সম্বন্ধে সারা পল্লীর ছেলে-

মেয়েদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সরিদের 'ছোটলোক' পাড়ায় এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ নয়।

উপসংহারে বিপ্লবী বালক-নেতা অরুণকুমার উত্তেজিতভাবে বললে, দেখবেন দাদু, ঢেলা মেরে ওর আব ফাটিয়ে দেব। পরে লক্ষ্য করি, মুহুরীবাবুর মস্তকের পশ্চাদভাগে বয়স্ক এক স্থূলকায় অর্বুদ বিদ্যমান।

শঙ্কিতভাবে বলি, না না, ওসব কিছু ক'রো না তোমরা। আমি বরং ওকে পুলিসে ধরিয়ে দোব।

সোৎসাহে হাততালি দিয়ে অরু বললে, সেই ঠিক। আচ্ছা হবে! লালপাগড়ী এসে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাবে। কেমন জব্দ! উৎসাহের চোটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের গোপনতা বিষয়ে ইতিমধ্যে সে অনবহিত হয়ে পড়েছে। কি ভেবে সামলে নিয়ে ফিসফিস ক'রে বললে, সুবলডাঙার মাঠ পেরিয়ে কাঁদরের ধারে কেয়াবনের পাশে আসছে-রবিবার বৈকালে আমাদের মীটিং। তুমি যাবে দাদু?—এই ধরণের অন্তরঙ্গতার ক্ষেত্রেই 'আপনি' 'তুমি'তে পরিণত হয়।

আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপল। তাদের এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে স্বীকৃত হই, উদ্দেশ্য—অবাঞ্ছিত একটা কিছু ক'রে না বসে।

গুপ্ত বিপ্লবী যে ভাবে তার সহকর্মীর নিরাপত্তার বিষয়ে সাবধান হয়, অনুরূপ সাবধানতায় তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করি।

মিটিং হয় নি। খুব সম্ভব লালপাগড়ীর আগমনের অপেক্ষায় ধ্বংসমূলক কার্যকলাপের পরিকল্পনা স্থগিত ছিল।

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত গুরুতর ঘটনার পরদিন সকালে এই ভেবে আশ্চর্য হই যে, এত সব জানা থাকা সত্ত্বেও ছেলেটাকে নিয়ে বিপন্ন হয়ে সাহায্যের আশায় সর্বপ্রথমে উকিল-গিন্নীর কথাই মনে পড়েছিল। 'পাড়াপড়শী মা-ষষ্ঠী'।

শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাত। আকাশ ও মন মেঘমুক্ত। উকিল-দম্পতির ছেলেমানুষিতে পুলক অনুভব করি। এবং পুলকিত মনে ডক্টর রায়ের বাড়ির উদ্দেশে পদব্রজে যাত্রা করি।

পথে যেতে যেতে এদের কথাই ভাবছিলাম। যত সহজে গ্রহণ করে, তত সহজেই বর্জন। গ্রাম সম্পর্ক বজায় রাখতে হ'লে, এই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যার ফলে আবার গ্রহণ। আবার ঝগড়া। আবার মিলন। এই ভাবটা পুরাতন হ'লে শেষ পর্যন্ত একটা কিম্ভূতকিমাকার সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। মোটামুটি একেই ওরা পাড়াপড়শী ব'লে অভিহিত করে।

আর ওরা—যাদের বাড়ি আমি বেড়াতে যাচ্ছি? গ্রহণ করে ধীরে ধীরে, তিলে তিলে, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে, এটিকেট রেখে। আর বর্জন? আজও আমার জানা নেই। সন্দেহ হয়, না-গ্রহণ-না-বর্জন-নীতিতে ওরা নিরাপদ নিরঙ্কুশ ভূমিতে সচ্ছন্দ-সুখবিলাসে বিচরণ করতে চায়। অনুসন্ধান শেষ পর্যায়ে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত উপন্যাসের উপকরণ সম্বন্ধে পূর্ব-বিচার আমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হবে না। তবে এটা ঠিক, বিনাসংঘর্ষে দুই দূরবর্তী বেগমান বস্তুর মিলন অসম্ভব। সমুদ্রমন্থন না হ'লে অমৃত উঠত কি?

...অতসীকে বুঝিয়ে বলতে হবে, এ তার অন্যায়। স্বাধীন ভাবে নিজের মত ব্যক্ত করবার অধিকার সকলেরই আছে। আমার লেখাটা ছাপা না হ'লেও 'নন্দিনী' প্রকাশে কৃতিত্বের অভাব ছিল না। প্রথমেই অতসীর কবিতা "পথের ধারের ঘর"।

ভাবতে ভাবতে এসে পড়েছি। পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই অপর এক বেগবান বস্তুর সঙ্গে আমার কলিশন হ'ল। উভয় পক্ষেই 'মে আই কাম্ ইন্' যেন ক্রমেই অনাবশ্যক হয়ে পড়ছে।

এই যে, আপনি এসেছেন! যাক, বাঁচা গেল! আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম। আপনার লাগে নি তো?

ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষ হ'লে নিশ্চয়ই তা প্রাণ স্পর্শ করত—তার নয়, আমার। বললাম, না, লাগে নি। কিন্তু ব্যাপার কি?

অতসীর অসুখ। দশ দিন হ'ল আজও জ্বর ছাড়ে নি। ডাক্তার প্লুরাসি ব'লে সন্দেহ করছেন। বড়ই মুশকিলে পড়েছি। পাশের ঘরের পর্দা ঠেলে ভিতরে যেতে যেতে বললে, আজ সকাল থেকে বার বার আপনার কথাই বলছে।

অনুমতির অপেক্ষা না ক'রে তার পিছু পিছু পাশের ঘরে প্রবেশ করি। আমার সঙ্গে কথাবার্তায় প্রভাতরবি অতসীর অপর নাম রেখেছে 'আপনার মেয়ে'। এরূপ ক্ষেত্রে তার ঘরে ঢুকতে সংকোচ প্রকাশ করতেই সংকোচ বোধ করি। আমাকে পৌঁছে দিয়েই প্রভাত-রবি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গিয়ে দেখি, অতসী চোখ বুঁজে শুয়ে আছে, শিয়রে চেয়ারে ব'সে পূর্ণিমা। তার মুখে ভোরবেলার অস্তমান চাঁদের ম্লানিমা দেখে চমকে উঠি। পরক্ষণেই এই ভাবটা সংযত করি। মনস্তাত্ত্বিক-উপন্যাস-লেখকের পক্ষে ভাবপ্রবণতা ভাল নয়। বহু বিনিদ্র রজনীর ধ্যানের বস্তু অন্তরের গূঢ় স্নেহে পরম যত্নে সৃষ্ট যে কোনও চরিত্রকে নিষ্ঠুর উপন্যাস-লেখক নিজ প্রয়োজনে যে কোনও পরিচ্ছেদে টুঁটি টিপে মারতে পারে। প্রকাশ্য দিবালোকে এই ধরনের হত্যালীলা ডিটেকটিভ উপন্যাসকেও হার মানিয়ে দেয়।

অতসী জেগে ছিল। আমাকে দেখে পূর্ণিমা চেয়ার ছেড়ে উঠল। খুট ক'রে শব্দ হ'ল। সেই শব্দে চোখ মেলে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, কাকাবাবু এসেছেন? বসুন। তার ম্লান মুখে ততোধিক ম্লান হাসি।

শুধু কি দুর্বলতা? তার সঙ্গে হয়তো একটু অভিমানও মেশানো ছিল।

আমার শুষ্ক শীর্ণ হাতখানা ওর কপালে রাখি। ভেলভেটের মত মসৃণ। হাতের স্পর্শ পেতেই অতসীর চোখ বেয়ে শরতের শুভ্রশিশির অজস্র ধারায় ঝ'রে পড়ল।

পাশের ঘর থেকে নানাপ্রকারের মিশ্রিত শব্দ কানে আসছে। ল্যাবরেটারির কাজ চলছে। মুশকিলটা তার কোন্‌খানে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। 'রিসার্চ' বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। অনাবশ্যক স্ত্রীর অবিবেচক অসুখের জন্য।

এক দিকে নিষ্ঠুর বৈজ্ঞানিক, আর কেউ নয়, তার স্বামী। অন্য দিকে হৃদয়হীন মনস্তাত্ত্বিক-উপন্যাসলেখক—তার কেউ নয়, পিতৃস্থানীয়, পাতানো কাকা। এই উভয় সংঘর্ষে প'ড়ে মেয়েটার ধ্বংস অনিবার্য এবং অদূরবর্তী, এর জন্য দার্শনিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। 'একটি শিশিরবিন্দু'। কি গুণ ছিল ঐ এক বিন্দু শিশিরের, কেমন ক'রে আমার হাতে ঠেকল—যার স্পর্শে আমার দেহমনের শিরা-উপশিরায় স্বভাবত অনতিচঞ্চল রক্তস্রোত প্রবলবেগে এবং ভিন্নপথে প্রবাহিত হ'ল! সেই একটি শিশিরবিন্দু আমার মনের ক্ষতে রক্তবিন্দু হয়ে দেখা দিল।

রিসার্চ ক'রে ও বিশ্ববিখ্যাত হোক, আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমার অদৃষ্টে উপন্যাস লেখা ঘ'টে উঠল না। উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে যে ব্যক্তি এত ঘন ঘন এবং ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ে, সে উপন্যাস লিখবে কখন্ কেমন ক'রে? প্রত্যেকটি মডেলকে যে ভালবেসে ফেলে ঢলাঢলি করে, তার পক্ষে ছবি আঁকা অসম্ভব।·· উপন্যাস চুলোয় যাক, মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে। আমার মনে দৃঢ়সঙ্কল্প উদিত হ'ল।

নীরবতা ভঙ্গ ক'রে অতসী বললে, আপনি এতদিন আসেন নি কেন?

আমি তো জানতাম না মা, তোমার অসুখ। এখানে এসে একটু আগে জানতে পারি।

রোগীজনোচিত ভাবাবেগ কেটে যেতেই, ওকে অনেকটা সুস্থ দেখায়। শুধোয়, আপনি চা খেয়েছেন? অনুদি বলছিল, আপনি খুব ঘন ঘন চা খান। এই ব'লে পায়ের দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করতেই পূর্ণিমা উঠে চ'লে গেল।

চারিদিকে চেয়ে দেখলে। মনে হ'ল, ওর গল্প করতে ভাল লাগছে। কথাবার্তার পথ খুলে দিতে অতসীর প্রিয় বিষয় নিয়ে আরম্ভ করি, অনুর মুখে শুনলাম, 'নন্দিনী'র জন্যে তোমাকে খুব খাটতে হয়েছে। সামনের দুটো মাস আমিই চালিয়ে নোব। তার পর বাঁধাপথে চ'লে যাবে নিজের গতিতে···

'নন্দিনী' আর বেরুবে না। আপিস, প্রেস—সব তুলে দিয়েছি।

সন্দেহ হ'ল, আমার জন্যেই কি এই কাণ্ডটা ঘটেছে? আমি নিজে অনুতপ্ত ও কুণ্ঠিত বোধ করলেও, আমার অন্তরের সেই চিরাভিমানী চিরন্তন শিশুটি খুশি হয়ে উঠল। কৌতূহল চেপে কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ এনে জিজ্ঞাসা করলাম, তুলে দিয়েছ? কেন, কি হয়েছিল?

কর্মসচিব বিভূতিবাবুকে নিয়ে গোল বাধল। প্রথমত, আপনার প্রতি তার অপমানজনক ব্যবহার, সে বরং বরদাস্ত করেছিলাম। শেষটায় কিশোরের পিছনে লেগেছিল। বলে—হয় ত পুলিসের চর, না-হয় বিপ্লবপন্থী। আমি ঝঞ্ঝাট সইতে রাজী নই। তাই সব কিছু চুকিয়ে দিলাম।

কিশোর কোথায়?

জানি না। শুনছি, এই শহরেই আছে। কোথায় থাকে, কেমন ক'রে তার দিন চলে, কিছুই জানি না।

আর বিভূতিবাবু?

এইখানেই আছেন। 'নন্দিনী' আপিসেই দুটো ঘর নিয়ে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। নীচের তলায় কোয়ার্টার্স আছে। শুনছি, সেইখানেই আছেন এখনও। ও-বাড়িটা ভাড়াটে নয়, কেনা। আমি নিষেধ করেছিলাম, 'উনি' শোনেন নি। আমোদ ক'রে বলেছিলেন, ঈশ্বর করুন, 'নন্দিনী' যদি দীর্ঘজীবন না পায়, আমি ওখানে ল্যাবরেটারি বসাব।

কথাটার মোড় ফিরিয়ে নিতে চাই। দরজার পানে তাকাই। পূর্ণিমা আসে না। তৎপরিবর্তে পর্দার পাশ দিয়ে মাথা গলিয়ে ঘরে ঢুকল ডক্টর রায়। তার দু হাতে দু কাপ চা। মাথায় কিঞ্চিৎ কাপড় টেনে দিয়ে অতসী পাশ ফিরে শুল।

সসার স্বদ্ধ ডান হাতের কাপটা আমার হাতে দিয়ে, সেই হাতে অনতিদূরবর্তী টি-পয়টা আমার কাছে টেনে দিলে। নিজে অতসীর বিছানায় বসল। বাঁ হাতের কাপটা ডান হাতে নিয়ে চুমুক দিলে। তার নিজের জন্য সসার ছিল না। দু-এক চুমুক দিয়ে ডাকলে, পূর্ণিমা!

আমার দিকে চেয়ে বললে, আমি একবার ডাক্তারের ওখানে যাব। আপনি ততক্ষণ ওর কাছে বসুন। আপনার হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু উপায় কি? দশটা বাজতে চলল, অনু-বউদি এলেন না এখনও।

বৈজ্ঞানিকের কোমল প্রাণ! জীবমাত্রেরই দুঃখ-কষ্টে বিচলিত হয়, শুধু আপন স্ত্রী ছাড়া। বুঝলাম, এই সময়টায় অনু এসে রোগীর কাছে বসে, ও যায় ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট দিতে। পূর্ণিমা ছেলেমানুষ। অভিভাবকের শুষ্ক কর্তব্য হিসাবে এইটুকু যে না করলেই নয়।

পূর্ণিমা এল। তার কাছে টেম্পারেচারের চার্ট নিয়ে ডক্টর রায় বেরিয়ে গেল।

পার্শ্বপরিবর্তন ক'রে অতসী বললে, যাও তো পূর্ণিমা, তুমি গিয়ে অনুদিকে ডেকে নিয়ে এস।

এইটুকু উল্লেখযোগ্য। এর আগে এই দম্পতি জোড়ায় কোনও দিন আমার সম্মুখে হাজির হয় নি। এই শালীনতা উপভোগ্য, নিজেকে সম্মানিত বোধ করি। 'গলায় ঝোলে মাদুলি'। প্রভাতরবির প্রবেশে আমার সমক্ষে তার এই সঙ্কোচ-প্রকাশ বাঙালী মেয়ের পক্ষে এটিকেট মাত্র, কিন্তু তা গভীর অর্থপূর্ণ। স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে "হ্রী" (লজ্জা) ভূষণস্বরূপ—ভদ্রতার পরিচয়, কথাটা খুব সম্ভব গীতায় পড়েছি। অবশ্য বাড়াবাড়ি সব ক্ষেত্রেই বিকটমূর্তি ধারণ করে, দৃষ্টান্ত যথা—দাতাকর্ণের ছেলে কেটে অতিথি-সৎকার। মেয়েদের লজ্জাশীলতা এক সময় আমাদের দেশে বাড়াবাড়িতে পরিণত হয়েছিল, পল্লীগ্রামে আজও আছে। কোনও কোনও অভিজাত সমাজেও এটিকেটের খুঁটিনাটি বিরক্তিকর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। কিন্তু এসব কথা আমার কিছু কাজে লাগবে না, উপন্যাস সমাজতত্ত্ব নয়।

পূর্ণিমা চ'লে গেলে আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে অতসী বললে, কাকাবাবু!

কিছু বলবে?

আমি যতদিন সেরে না উঠি, আপনি তো রোজ আসবেন?

এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

হ্যাঁ, আপনি রোজ আসবেন। একটু ইতস্তত ক'রে বললে, বলছিলাম কি, আমাকে দেখাশোনা করবার লোকের অভাব নেই, কোনও ত্রুটিই হচ্ছে না। কিন্তু একটা কথা কি জানেন কাকাবাবু,

নিজের শরীরের দিকে মোটেই লক্ষ্য নেই কিনা। পাঁচ রাত্রি সমানে জাগছেন। দিনের বেলা এরা সব আমার কাছে থাকে, রাত্রে থাকেন নিজে। নিজের রিসার্চের কাজ, সে উনি একদিনও বাদ দিতে পারেন না। এমন ক'রে কদিন যুঝবেন? মানুষের শরীর তো!

ডক্টর রায়ের কথা বলছে। কে যেন জোরে আমার মনের গায়ে চাবুক বসিয়ে দিলে। এতক্ষণ তার বিষয়ে কি সব আবোল-তাবোল ভাবছিলাম আমি! এ কথাটা শুনেও কিন্তু খুব খুশি হতে পারলাম না। উপন্যাস লেখা কোনও দিনই আমার ঘ'টে ওঠে নি, উপকরণ সংগ্রহ করতেই জীবন কেটে গেল—তাই আজ আত্মসমালোচক আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি, নানান চরিত্রের বিশ্লেষণ নিয়ে যাঁদের কারবার, তাঁরা কোনও দিন ভেবে দেখেন নি যে, সবচেয়ে অদ্ভুত তাঁদের নিজের চরিত্র। একটু আগে যার জীবনাশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম, তার জীবনে কোনও সমস্যা নেই, দাম্পত্যজীবনে সে সম্পূর্ণ সুখী—এই কথা জানতে পেরে কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ি। সমস্যাহীন নিষ্কণ্টক শান্তিপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ নিয়ে কবিত্ব চলে, উপন্যাস একদম অচল। পরম শান্তি এবং চরম দুর্ঘটনার জের চলে না। উপন্যাস-লেখক এই দুটোর মধ্যবর্তী অবস্থা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন—এই তাঁর খেলা, যদিও যে-কোনও একটা দিয়েই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অবশ্য তখন এতটা তলিয়ে বুঝতে সময় পাই নি। আমাকে চমকিত ক'রে অতসী ডাকলে, আচ্ছা কাকাবাবু!

আমি বুঝতে পারছি, অতসী; কি যেন তোমার বলবার আছে। যদি আপত্তি না থাকে—

সেই কথাটাই ভাবছি। একটু ভেবে ও যেন সাহস সঞ্চয় ক'রে

নিলে। চক্ষু নত ক'রে বললে, কারও মনে যদি কিছু গোপন কথা থাকে, তা কি আর কাউকে বলা উচিত ?

এ সব কি বলছে অতসী! তার এই ক্ষুদ্র জীবনে এমন কি গুরুতর বিষয় থাকতে পারে, যা তার মনকে এই ভাবে পীড়িত করছে ? আমার মনে সন্দেহের ছায়া পড়ল। উপন্যাসের পক্ষে অনুকূল হ'লেও, অসুস্থ অবস্থায় এই ধরনের দুশ্চিন্তা তো তার পক্ষে ভাল নয়।

বললাম, না, তা কখনও বলা যেতে পারে না। বললে খারাপ ফল হয়। কথাটা যদি অন্যায় হয়—মনের পাপের কি ইয়ত্তা আছে, মা ? আমি যদি আমার মনের সব খবর সবাইকে বলি, তারা প্রচার ক'রে বেড়াবে, আরও ঠেলে দেবে আমাকে অন্যায়ের পথে—একেবারে দাগী না ক'রে ছাড়বে না। সংসারে দরদী কজন আছে ? অবশ্য, এমন লোকও দু-একজন থাকতে পারে, সে খুব কম, এত কম যে অনেকেরই ভাগ্যে জোটে না, যাকে সব কথা খুলে বললে মন হয়ে যায় হালকা, সব গ্লানি ধুয়ে মুছে যায়! কিন্তু তুমি বড় বেশি কথা কইছ, ক্লান্ত হয়ে পড়ছ। এতে তোমার অসুখ বেড়ে যাবে। একটু ঘুমোও দেখি।—এই ব'লে তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে থাকি।

অতসী বললে, একটা কথা আপনাকে আমি বলব, কিন্তু আজ নয়। হ্যাঁ, যদি বাঁচি, আপনাকে বললে উপকার হতে পারে। না বাঁচলেও, আত্মার কল্যাণ হবে তাতে। আচ্ছা কাকাবাবু, আমি বাঁচব তো ?

এমন সময় ডক্টর রায় এসে ঢুকল। তার পিছু পিছু ডাক্তার, অনু, পূর্ণিমা। অনেকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন ডক্টর রায়, আপনার কথামত এসে ভালই করেছি। প্রেসক্রিপ্‌শনটা একটু পালটে দিতে হবে। অনেকটা ক'মে গেছে। আমি তো আগেই বলেছিলাম, এ আমার সন্দেহ, কিছু নাও হতে পারে। আমাদের

আঁটঘাট বেঁধে কাজ করতে হয়। তবে এটাও ঠিক যে এখনও খুব সাবধানে থাকতে হবে। গুড বাই।—এই ব'লে টুপি তুলে নিয়ে চ'লে গেলেন।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক চিন্তা এসে জুটল, অতসী আমাকে যে কথাটা বলতে চেয়েছিল, তা এমন কি হতে পারে? বাধা না পেলে নিশ্চয় সে বলত। ইহকালের উপকার, পরকালে আত্মার কল্যাণ—এই সব কথার অর্থ কি? একবার মনে হ'ল এসব তার ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছু নয়। একটা সামান্য বিষয় ওর অসুস্থ দুর্বল মস্তিষ্ককে পেয়ে বসেছিল। তুচ্ছ একটা সমস্যা, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কিছু।

কে জানি কি!

১৪

কিন্তু আমার সম্মুখে কঠিন সমস্যা। মানুষ হয়ে জন্মেছি, মানুষই থাকব, না, উপন্যাস-লেখক হব? বেশ বুঝতে পারছি, কতকটা 'অমানুষিক' না হ'লে তার দ্বারা উপন্যাস লেখা অসম্ভব। আমার পক্ষে দুটো পথ খোলা আছে—

প্রথম, ওদের মনের অমিল মনেই থাক্। 'গোপন-কথা' নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কি লাভ হবে? মতের মিল নিয়ে ভদ্রভাবে ঘরসংসার করছে, এই যথেষ্ট। এই ভাবে কোনও এক শুভ মুহূর্তে মনের মিলও ঘ'টে যেতে পারে। ঘটক ঠাকুরদের শুভাগমন হ'লে তো কথাই নেই।

ছেলেমেয়েদের আমি 'ঘটক ঠাকুর' ব'লে থাকি। দাম্পত্য-জীবনে এরাই আদি না হোক—অকৃত্রিম ঘটক। শুধু দাম্পত্যজীবনে কেন, দুই অপরিচিত প্রতিবেশী পরিবারে ওরাই প্রথম যোগসূত্র স্থাপন করে।

লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, ছেলেমেয়েদের মধ্যস্থতাতেই এই শহরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

অতসীর কোলে ছেলে। ভাবতে মনে পুলক জাগে। উত্তরচরিতে পড়েছিলাম, বশিষ্ঠ আসন্নপ্রসবা সীতার বিষয়ে ব'লে পাঠিয়েছেন "কদা পুত্রোৎসঙ্গাং বধূং পশ্যামি"—ছেলে-কোলে বউমাকে কবে দেখব? সেই থেকে ছেলে-কোলে-করা ছোট ছোট বউ-ঝি দেখলে আমি হাঁ ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখি। চোখে চোখ পড়লে তারা লজ্জিত হয়। তারা তো জানে না যে, আমি ভবভূতির সৌন্দর্যবোধের তারিফ করছি।

এই গেল মোটামুটি ভদ্র এবং সাংসারিক দিক। অমানুষিক দিকটা এই—

আস্তে আস্তে গোপন কথাটি উদ্‌ঘাটিত ক'রে ওদের মনের তলার যত কিছু পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে চোখের সামনে তুলে ধরা! উদ্দেশ্য পঙ্কোদ্ধার নয়—তা হ'লে উপন্যাস হয়ে যাবে নীতি-বাগীশ। সেই পাঁকে ওদের একজনকে, প্রয়োজন হ'লে দুজনকেই, ডুবিয়ে মারতে হবে। ঔপন্যাসিক প্রেম-পদ্ম এই পাঁকেই জন্মগ্রহণ করে।

বিবাহোত্তর ঘটক ঠাকুররাও অনেক সময় এঁটে উঠতে পারেন না। দেখা গেছে, পুরো দমে দাম্পত্য-দ্বন্দ্ব চলেছে, হঠাৎ আঁতুড়-ঘরে প্যাঁ ক'রে ছেলে কেঁদে উঠল। তাতে দ্বন্দ্ব মিটল না, দ্বন্দ্ব হ'ল অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিণত, উপন্যাস জটিল আকার ধারণ করল। শেষ পর্যন্ত খোকাকে ফেলে—

ছেলে ফেলে যারা ছাড়াছাড়ি হয়, তাদের মনস্তত্ত্ব আমার জানা নেই। তবে এই নিয়ে যাঁরা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস লেখেন, তাঁদের আমি ভয় ও শ্রদ্ধা দুই-ই করি। তাঁরা আচার্য জগদীশচন্দ্রের সমকক্ষ লোক। গাছেরও জীবন আছে। পশুরও মনস্তত্ত্ব আছে।

আমার পক্ষে আর একটা পথ খোলা আছে—কোনও পথেই না

হাঁটা, মানে—চুপ ক'রে ব'সে থাকা। বেশ আরামপ্রদ। কিন্তু আপাতত তারও উপায় নেই।

সেদিন যার সামান্য অসুখের কথা ভেবে জীবনমরণ-সংশয়ে অধীর হয়ে পড়েছিলাম, মনের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হই, এখন তার সম্বন্ধে ভদ্রতা ও কর্তব্যবোধ ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

সকাল-সন্ধ্যে নিয়মিত যাই আসি, জ্ঞানত তদ্বির-তদারকের ত্রুটিও কিছু করি নি, কিন্তু আমার প্রাণের সে ব্যাকুলতা কোথায়? এ যেন কেউ জোর ক'রে আমাকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নিচ্ছে।

না, তার মনের গোপন কথা আমার জেনে কাজ নেই। সন্দেহ সন্দেহ হয়েই থাক্। আমার ভয় হ'ল, উলঙ্গ সত্য বিকটমূর্তিতে যদি কখনও সামনে এসে দাঁড়ায়, হায়, আমি তা সইতে পারব না। রোজ সেখানে গেছি, কিন্তু নিরিবিলি কথাবার্তার সুযোগকে পাশ কাটিয়ে চলেছি বরাবর।

এই কয়দিন কিশোরকে ওখানে দেখতে পাই। সে তা হ'লে এই শহরেই ছিল। মা-মরা ছেলের মত পথে পথে ঘুরছিল বোধ হয় এবং সম্ভবত অতসীর অসুখের সংবাদ পেয়ে এসে জুটেছিল। আমার বিশ্বাস, অতসী আরও কিছুদিন বিছানায় প'ড়ে থাকত, শুধু কিশোর-পূর্ণিমার শুশ্রূষার গুণে এত শীগ্‌গির উঠে বসতে পেরেছে। অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি, কোনও কোনও দিন একটু আধটু জ্বর আসে। অনু বিশেষ কিছু করতে পারে নি, আহা, ওকে পেটের জন্যে খাটতে হয়।

একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে আশ্চর্য বোধ করলাম। চঞ্চলতার প্রতিমূর্তি পূর্ণিমাকে আর দেখতে পাই নি। এ যেন স্থির ধীর সেবাপরায়ণা নারী! ভাবলাম, অতসীকে ও ভালবাসে, অতসীর অসুখই এর কারণ হবে। কিন্তু—

সেদিন আমি আর ডক্টর রায় ব'সে ছিলাম ল্যাবরেটারি-ঘরে। অতসীর ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে আমার পাশে চুপ ক'রে ব'সে রইল পূর্ণিমা।

একটু পরে পূর্ণিমার দিকে চেয়ে ডক্টর রায় বললেন, চার্টটা নিয়ে এস। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

পূর্ণিমা বললে, আমি পারব না, আপনারা কেউ যান।

বিরক্ত হয়ে প্রভাত বললে, দিন দিন তুমি ভারি অবাধ্য হয়ে উঠছ পূর্ণিমা। কিন্তু নিজের কথাতে নিজেই বিশেষ জোর পেলে না যেন, কারণ সত্যের অপলাপ ছিল তাতে। সব সময়েই দেখছে এবং ভাল ক'রেই জানছে যে, অবাধ্য সে মোটেই হয় নি, বরং কর্তব্যকেও ছাপিয়ে উঠেছে অনেক দূর।

পূর্ণিমা শুধু বললে, কাকীমা ঘুমুচ্ছেন যে! কাকীমা মানে—অতসী। এক ঝলক রক্ত তার মুখের চামড়া ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়।

প্রভাত কি বুঝলে জানি না, কিন্তু আমার বুঝতে বাকি রইল না। পাছে এই নিয়ে তর্ক ওঠে, আমি উঠে গিয়ে চার্টটা নিয়ে আসি। অতসী সত্যিই ঘুমুচ্ছিল, কিশোর তার মাথার কাছের চেয়ারটায় দেওয়াল ঘেঁষে ব'সে ছিল। তার ডান হাতে পাখা, বাঁ হাতে বই, দুটো কাজ একসঙ্গেই চলছিল।

এই সব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ডক্টর রায়ের বুদ্ধিটা বেজায় ভোঁতা। অতসী ঘুমুচ্ছে, কিশোর আছে তার ঘরে, পূর্ণিমা একা যায় কেমন ক'রে? লজ্জা করে না বুঝি?

কুসুমে কীট ঢুকেছে। সেই রঙ-বেরঙের জনপ্রিয় কীট, যা পাখা মেলে গায়ে বসলে আনন্দ হয়।

...কিন্তু ওদের কথা থাক্। আগেই বলেছি, এমন অনেক গল্প,

অনেক উপন্যাস, অনেক কবিতা লিখতে শুরু করেছি, কিন্তু কিছুই শেষ করতে পারি নি। সে সমস্ত লেখা "অসম্পূর্ণ" নাম দিয়ে পৃথক একটা ফাইল ক'রে রেখে দিয়েছি। মাঝে মাঝে নিয়ে বসি, যদি তাদের কোনও একটাকে ধ'রে শেষ করতে পারি, কিন্তু আজ এতদিন পরে প্রত্যেকটিই যেন খাপছাড়া ব'লে মনে হয়। অতসী, পূর্ণিমা, কিশোর, প্রভাত, অণু এবং 'নন্দিনী'—এরা থেকে যাক আমার মনের আলমারিতে অসমাপ্ত একটা গল্প হয়ে।

বিপদ কখনও একা আসে না। সরিরও অসুখ। আজ কদিন ধ'রে রক্তামাশয়ে ভুগছে। 'ব্যালফুল' তাকে নিয়ে ব্যস্ত। আমার নিজের কাজ সব নিজেকেই ক'রে নিতে হচ্ছে। অবশ্য রান্নাঘরে ঢুকি নি, বসবার ঘরে স্টোভটাতেই সব কাজ চ'লে যায়।

কাব্যসাধনায় দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে "শুষ্কং কাষ্ঠং" খুলে বসি। লেখার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিল। দুঃখের বিষয়, উক্ত মহাকাব্যের এই অংশটুকু আপনাদের আমি উপহার দিতে পারছি না—স্বর্গে চ'লে গেছে। তার কারণ পরে বুঝতে পারবেন। এই অংশের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে" অর্থাৎ মানব-সভ্যতার ইতিহাসে শুকনো কাঠের স্থান সর্বাগ্রে।

একমনে লিখছি, ঘড়িটা টং টং ক'রে বেজে উঠল। চেয়ে দেখি দশটা। কাজেই উঠতে হ'ল। স্নান সেরে, দেশলাই ও স্পিরিটের বোতল নিয়ে ঘরের মেঝেয় এক কোণে নামানো স্টোভটার সামনে উবু হয়ে বসি। টেবিলের ওপর খাতাটা খোলাই রইল, ভাত চড়িয়ে দিয়ে লিখতে বসব। ভাত ফুটবে টগবগ টগবগ, তালে তালে চলবে কবিতার ছন্দ। হঠাৎ পদশব্দ শুনে পিছন ফিরে দেখি—

আমার জীবনমরণ-সমস্যার স্পাই—নগেন্দ্রবালা! তার কোলে সেই ছেলেটা, যার কৃপায় আমি বিশ্বরূপদর্শনে ধন্য হয়েছিলাম।

বিশ্বরূপকে ধপ ক'রে আমার লেখাটারই ওপর বসিয়ে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললে, খুব হয়েছে দাদা, ওঠ দিকি এইবার। বলি, এই সব কাজ কি বেটাছেলের? মরি মরি, বুড়ো বয়সে হাত পুড়িয়ে খাওয়া! কেন, আমরা কি ম'রে গিছি, না, হাতে হয়েছে মহাব্যাধি! আচ্ছা সব পাড়ার লোক যা হোক! আমরা না হয় সাতখানা বাড়ির পর—পাড়ায় কি আর বামুন নেই? এই তো সামনের বাড়ির মুকুজ্জেরা—

স্টোভে স্পিরিট ঢালতে গিয়ে আমার হাত থেকে বোতলটা গেল প'ড়ে।

কেন করতে গেলে? বোতলটা ফেললে তো? উঠবে? না—? এই ব'লে আমার হাত ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে বসিয়ে দিলে আমার কাব্যসাধনার যোগাসনে।

বললে, তার চেয়ে বরং খোকাকে কোলে ক'রে ব'সে ব'সে দেখো, আধ ঘণ্টায় কি কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড ক'রে ফেলি!

করুণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখি, বিশ্বরূপ আমার খাতাখানায় ব'সে তার একটা কোণ ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরেছে। সভয়ে অবলোকন করি, আমার কবিতার ঠিক সেই অংশটা ওর বদনবিবরে প্রবেশ করেছে—

উজাড় হবে লোহার খনি, ধ্বংস হবে এ সভ্যতা,
অমর হয়ে থাকবে বেঁচে—গাছের গুঁড়ি, পাতা, লতা।

অতএব প্রমাণ হয়ে গেল যে, আমাদের এই যন্ত্র-সভ্যতা একদিন বিশ্বরূপের মুখগহ্বরে বিলীন হবে।

নিরুপায় হয়ে বিশ্বরূপকে দু হাতে ক'রে তুলে ধরি। প্রভুর ঘর্মসিক্ত অঙ্গবিশেষে প্রায় সমগ্র পাতাটি সুমুদ্রিত। প্রথমে লক্ষ্য করি নি, চোখে পড়ল তখন, যখন দেখি, ওকে কোলে করতেই আমার ধবধবে সাদা লংক্লথের জামাটায় তার দ্বিতীয় মুদ্রণ।

আমার যতদূর জানা আছে, এতটা খাতির পৃথিবীর অন্য কোনও কবির ভাগ্যে জোটে নি। আমার কবিতার এক মিনিটে দ্বিতীয় মুদ্রণ দেখে পুলকিত হতে যাচ্ছি, কিন্তু পাণ্ডুলিপির অবস্থা দেখে অশ্রুসংবরণ করা কঠিন হ'ল। একটি অক্ষরও তার পড়া যায় না।

স্টোভ জ্বালতে জ্বালতে নগেন্দ্রবালা ব'কে চলল! আজ কদিন ধ'রে খুঁজে মরছি—একবার আসি আমি, একবার আসে ছোটদা, তা আমার ভবঘুরে পাগলা দাদাটির দেখাই নেই!—বলতে বলতে আমার দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায় এবং চক্ষের পলকে আমার বাঁধানো খাতা থেকে কবিতা-লেখা পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে। আমার বাধা দেওয়ার কিছু কারণ ছিল না, বিশ্বরূপ তার যে অবস্থা করেছিল, তার থেকে পাঠোদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

কাগজখানি নিয়ে পাট ক'রে স্টোভের কাছে পাতলে। আঁচলের খুঁটে কি বাঁধা ছিল, তা খুলে সেই কাগজটার উপর রাখলে। মুগের ডাল। তার সঙ্গে গুটি কয়েক আলুপটল। কাপড়ের অন্য খুঁট খুলে বের করলে গোলগাল মাঝারি সাইজের ভয়লেট-রঙের বেগুন একটা। তার পর পিছনে কোমরের দিকে হাত চালালে। অবাক হয়ে দেখি, সেখানে গোঁজা ছিল মেয়েদের খেলাঘরের ব্যবহার্য ছোট্ট একটি বঁটি।

বুঝলাম সমস্তই পূর্ব-প্রকল্পিত এবং স্পাইগিরিও সত্যি।

সৌভাগ্যের বিষয়, এইসবে মনোযোগ করতে গিয়ে নগীর বক্তৃতা-স্রোত আপাতত বন্ধ ছিল।

বিশ্বরূপ কিন্তু এতক্ষণ ধ'রে চুপ ক'রে ব'সে ছিল না। এবারও কিন্তু সেই বাঁশীটা আমাকে সাহায্য করলে। তার মুখের দিকটা ওর মুখে ধ'রে ফুঁ দিতে শিখিয়ে দিলাম। অল্প চেষ্টাতেই আংশিক কৃতকার্য হই। অক্ষম আওয়াজ বের করতে পেরে, মহা খুশি হয়ে টেবিলের ওপর ব'সে একমনে খেলা করতে থাকে। বাঁশীতে ফুঁ দেয় আর মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলে, তাদ্‌দাঃ!

কড়াইয়ের গরম তেলে আলু পটল ছেড়ে দিতে দিতে সপরিহাসে নগেন্দ্রবালা বললে, বাব্‌বাঃ! অর্থাৎ, খুব ভাব দেখছি যে!

আঃ, বাঁশীটা! কোথায় যেন কিনেছিলাম! জাপানের এক ছোট শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাজার আমার স্মৃতির পর্দায় চিত্রিত হয়ে উঠল।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে আছি। কিন্তু বিপদ কখনও একটা আসে না। আমাকে চমকিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন, আমার টেকো বন্ধু—নগীর দাদা। চিনতে ভুল হয় নি—হ্যাঁ, তিনিই তো, সে রূপ কি ভোলবার!

কিছুমাত্র অভিবাদন বা ভূমিকা না ক'রে একগাল হেসে বললেন, কোথায় ছিলেন এ কটা দিন? আমরা এদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রান—যাকে ব'লে, গরু খোঁজা। নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন, খাওয়া-দাওয়া হয় নি তো? চলুন, আমাদের ওখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজনটা সারবেন আজকে দয়া ক'রে।

ছেলেবেলায় যাত্রা-পালায় দেখেছিলাম, নর্তক-নর্তকীবেশে বিপদ ও ঝঞ্ঝার প্রবেশ। একবার নয়, গোটা পালাটা জুড়ে, প্রতি অঙ্কে অন্তত পক্ষে একবার। 'এ মায়া-প্রপঞ্চময় ভবরঙ্গমঞ্চ-মাঝে' বহু—বহুবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপমার সাহায্যে তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি। সেইজন্যে, পুনরুক্তি হ'লেও, একাধিক ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখ আমার

পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়ে। আজও তাদের দেখা পেলাম। আশ্চর্য, কোনও সময়েই, কি উক্ত অভিনয়ে, কি সংসার-ক্ষেত্রে ওরা কেউ একা আসে নি। কখনও একসঙ্গে, কখনও একটু আগে-পরে।

বিপদ বললে, আজ ছোট বউ (তার স্ত্রী) নিজে রেঁধেছে। খেয়েই দেখবেন, রান্না তো নয়, যেন অমৃত। উঠুন, বেলা হ'ল আর দেরি নয়। স্নান সেরেছেন তো? না হয় ওখানেই সারবেন।

ঘরের কোণে ঝঞ্ঝা এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসছিল। উৎসাহের আতিশয্যে বিপদ তাকে দেখতে পায় নি। বেচারা ভাবতেও সময় পায় নি, আমার টেবিলে খোকা কেমন ক'রে এল! খোকা একমনে খেলছিল, বোধ হয় লক্ষ্যই করে নি এতক্ষণ। স্টোভের শব্দও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

ঝঞ্ঝা যখন কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে বেগুন ছেড়ে দিলে, সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে বিপদ তাকে দেখতে পেলে। সর্পদর্শনকারী পথিকের উপমাটি স্মরণ করুন।

এদিকে বিপদের মুখে তার স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা শুনে ঝঞ্ঝা উঠল তেলে-বেগুনে জ্ব'লে! ঝঞ্ঝার বেগে উঠে এসে সে মারমূর্তি হয়ে দাঁড়ায় তার ছোটদার সম্মুখে। ফুটন্ত তেলে বেগুনগুলো কলকল শব্দে নাচতে থাকে।

বললে, কি বলছিলে ছোটদা, আর একবার বল দিকি শুনি? ছোটবউদির রান্নার কথা হচ্ছিল বুঝি? বলব তবে কুলের কথা খুলে?—গুলি চালাবার নোটিশ দিয়ে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়ে দিলে। কুলের কথাটা এই—বিপদ-পত্নী চিররুগ্ণা, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন তার সংসারের রান্না নগেন্দ্রবালাই রাঁধে। আজও রান্না সেরে এখানে এসেছে।

বিপদে প'ড়ে বিপদ নিজের উপস্থিতবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে। গদগদ ভাবে বললে, তোর এই স্বভাব নগী! সব কথাতেই ভুল বুঝিস। আমি কি ছোটগিন্নীর কথা বলেছি? আমি বলছিলাম ছোট-বউমার কথা।

বেগুনভাজা নাড়াচাড়া ক'রে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে কোমরে দুই হাত রেখে বললে, আচ্ছা দাদা, বউদি কি তোমাকে তুকতাক কিছু করেছে না কি? একেবারে ভেড়া ব'নে গেলে? বলি, হ্যাঁগা ছোটদা, ছোটবউমা যে আজ ভোরের ট্রেনে বাপের বাড়ি চ'লে গেল!

ভীতভাবে চিন্তা করছি, এইবার বুঝি ঝম্‌ঝমাঝম্‌ নৃত্য শুরু হয়।

টেকো মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আমতা আমতা করে বিপদ।—তা বটে, তা বটে, আমার যেন হুঁশই থাকে না কোনও কিছুতে। আসলে কি জানিস নগী, ভদ্রলোককে একটা কথা বলার তাই বলছিলাম। স্টোভের দিকে চেয়ে, ও তাই বল্‌! তুই বুঝি রাঁধছিস? এখানে ভদ্রলোকের জন্যে? তবে আর কি! এক রকমে হ'লেই হ'ল। যেন তেন প্রকারেণ ভজ কৃষ্ণ-পদাম্বুজম্‌।

অসামান্য প্রতিভাবলে ঝঞ্ঝা আমার ছোট আলমারিটা খুলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বের ক'রে নিয়েছিল। তার ডালা দুটোর সূক্ষ্ম তারের জাল ছাড়া আর কোনও স্থূল নির্দেশ ছিল না। এটা সে আলমারি নয়, যার বুকের ভিতর পূর্ণিমার কণ্ঠসঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—মে আই কাম্‌ ইন্‌! সেটা ছিল এ কোণের বই রাখবার বড় আলমারিটা।

বাঁশীটা নামিয়ে রেখে, বিশ্বরূপ অপর একখানা বাঁধানো খাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত করছিল। সেই কীর্তি পূর্ণাঙ্গ

স্থাপিত হয়েছে দেখে পুনশ্চ বাঁশীটা তুলে নিয়ে বেশ জোরে একটা ফুঁ দিলে। কিছুক্ষণ চর্চার ফলে তার কসরৎ-শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। আওয়াজটা বেশ স্পষ্টই হ'ল এবার।

এই ধরনের বংশীধ্বনি যাত্রার দলে দৃশ্যান্তর সূচিত করে।

ঝঞ্ঝার নির্দেশক্রমে বিশ্বরূপকে কোলে নিয়ে বিপদের দ্রুত প্রস্থান। ঝঞ্ঝার তাড়া খেয়ে আমার আহারে উপবেশন। ঝঞ্ঝার পরিবেশন, ফলে অনিচ্ছাকৃত গুরুভোজন।

স্নেহমিশ্রিত অন্নব্যঞ্জন! বহুদিন ও-রসে বঞ্চিত। 'ব্যালফুলে'র শিশুক্রীড়া মনে পড়ল। মনে পড়ল, অনুর হাতের তৈরি এক পেয়ালা চা।

যাবার সময় বিপদ তার জের রেখে গেল, কালকে কিন্তু ছাড়ছি না দাদা। আমাকে খাইয়ে ঝঞ্ঝা তার বেগ রেখে গেল—এ আর কতক্ষণের কাজ দাদা! নতুন দাদার সংসার তো আমার জানাশোনা ছিল না! আমি রোজ এসে করতে পারি। তুমি ঘড়ি ধ'রে ব'সে থাক, দেখ, আমি পনের মিনিটে—ওই যে কি ব'লে—ভীষ্মপব্ব, দোরোণ-পব্ব সব শেষ ক'রে যাব!

এইবার শান্তিপর্ব। স্টোভের কাছ হতে কবিতার ছেঁড়া পাতাটা কুড়িয়ে এনে "অসম্পূর্ণ" ফাইলে গেঁথে রাখি। যদি কখনও পাঠোদ্ধার হয়!

ইতি 'শুষ্কং কাষ্ঠং'। যন্ত্রসভ্যতা যখন বিশ্বরূপে বিলীনই হবে, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ?

ইতি কাব্যসাধনা। মানুষের প্রতি ভালবাসা যাঁর কর্মজীবনের মূলমন্ত্র ব'লে আপনারা জানেন, দেখা করতে গিয়ে দ্বারপ্রান্তে জবাব পাবেন—সময় নেই, কবিতা লিখছেন। মিথ্যার চূড়ান্ত! আমি ঠিক জানি, এসব আমাদের শখ, এসব আমাদের হবি, এ সব আমাদের

ম্যানিয়া। অনেক ছোট ছোট হৃদয়কে দলিত ক'রে চলে রাজকবির জয়যাত্রার রথ। এই রকম অবস্থায় আমি যদি কবি হ'তে না চাই, আপনারা তো আমাকে বাধ্য করতে পারেন না? আমার মনে হয়, এই অসম্পূর্ণ অসমাপ্ত অর্ধপরিচিত মানবজীবনে, আপনাদের উচিত, আমার অসম্পূর্ণ কবিতাগুলোই বেশি ক'রে পড়া।

আমি তো প্রথম দিনেই অতসীকে বলতে পারতাম—এখন আমার সময় নেই কবিতা শোনবার, তুমি বরং খাতাখানা রেখে যাও, সময়মত প'ড়ে দেখব, তারপর না প'ড়ে ফেরত দিয়ে যদি বলতাম—বেশ লাগল, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, ছাপাও না কেন—ইত্যাদি, কি ক্ষতি হ'ত তাতে? ঠিক একই কৌশলে বিপদ এবং ঝঞ্ঝাকে দূরে ঠেলে রাখা যেত—স্বপাক খাই কিংবা আর কিছু ব'লে।

ওদের ধারণা, ওদের খোকাকে আমি বাঁচিয়েছি। এর জন্য কৃতজ্ঞতা কিংবা এই ব্যাপারে আমার যে দুর্ভোগ এবং অপমান—তার জন্য দুঃখ, লজ্জা অথবা অনুতাপ প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করে না। অথচ আমার একাকীত্বের অসহায়তা স্থায়ী ভাবে দূর করতে চায়।

নগীর কথা আমি অবিশ্বাস করি নি। রোজ এসে রেঁধে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব এবং আমার চক্ষে বিচিত্র কিছু নয়। ছেলেবেলায় পাড়ার এক মাসীকে বলেছিলাম—মাসী, তুই যা চচ্চড়ি রাঁধিস? সেই দিন থেকে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্য্যন্ত প্রতিদিন খাবার সময় তাঁর রাঁধা চচ্চড়ি এসে আমাদের বাড়িতে হাজির হ'ত!

এটিকেটের ধার ধারে না, কিন্তু ওদের আন্তরিকতা আমার প্রাণস্পর্শ করে। আসলে খোকাকে বাঁচানো একটা সূত্রমাত্র, মানুষকেই ওরা ভালবাসে কিংবা পরকে আপন করা ওদের একটা শখ, হবি, ম্যানিয়া।

সবচেয়ে বড় কথা, এদের মধ্যে কোনও গোপন কথা নেই।

বিপদ কখনও একা আসে না।—এই কথা যদি প্রথম বিপদের সম্বন্ধে খাটে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিপদেরও সে অধিকার নিশ্চয়ই আছে। বিশেষ ক'রে উপন্যাসের উপকরণ হিসাবে এদের মূল্য অনস্বীকার্য।

সাহিত্যসৃষ্টিতে বিতৃষ্ণ হ'লেও, সাহিত্যচর্চায় অরুচি ধরবার কারণ নেই! লেখার পথে অশেষ কণ্টক, পড়ার নেশায় বাধা দেবে কে? সেদিন সন্ধ্যায় যৌবনে-পড়া বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীখানা ঝেড়ে মুছে নূতন ক'রে পড়তে বসি। প্রভাত, অতসী, অনু, কিশোর, পূর্ণিমার চেয়ে প্রতাপ, শৈবলিনী, সূর্যমুখী, চন্দ্রশেখর, রোহিণী ঢের ভাল। অন্তত এরা আমার দৈনন্দিন জীবনকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলবে না।

'তুমি বসন্তের কোকিল'—সবাই জানেন, এই বসন্তের কোকিলই রোহিণীর পদস্খলনের কারণ হয়েছিল এবং হয়তো প্রাণরক্ষারও। সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বটবৃক্ষের (ভূতপূর্ব আমি) পদস্খলনের ইতিহাস পূর্বেই বলেছি। অচিন পাখি! ছাড়া পেয়ে বেঁচে গেছি। কিন্তু সেই সন্ধ্যার নবারব্ধ রোহিণী-কোকিল-সংক্রান্ত অতি নিরীহ সাহিত্য-চর্চাতেও আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পদস্খলন ঘটল।

ও কিসের গোলমাল? ক্রন্দন, চিৎকার এবং হাহাকার! মনে হ'ল, যেন সরিদের পাড়া থেকে আসছে।

আগুন?

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, না, আগুন নয়। রাস্তা থেকে সরিদের পাড়া দেখা যায়।

গ্রন্থাবলী বন্ধ ক'রে খালি পায়েই ছুটে যাই, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব। গিয়ে দেখি—

খুন!

আমাকে দেখে গোলমাল কিছু কমল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাই। সরির কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে এক অপরিচিত যুবক, তার আহত মস্তক থেকে রক্ত ঝ'রে ঝ'রে সরির কোল ভেসে যাচ্ছে। সরির ক্রন্দন আর্তনাদে পরিণত হ'ল।

নিহত কিংবা আহত ব্যক্তিকে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, নিহত নয়, আহত। আঘাত কিছু গুরুতর হ'লেও মারাত্মক নয়। প্রচুর রক্তপাতে কিংবা রক্ত দেখে ভয়েই সে চেতনা হারিয়েছে। সরিকে থামিয়ে সকলকে গোল করতে নিষেধ ক'রে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরি।

আমার কাছে প্রাথমিক সাহায্যের বাক্স ছিল। সেইটা নিয়ে ফিরে আসি। রক্ত ধুয়ে ফেলে চোখে মুখে জল দিতেই ছেলেটা চোখ মেলে চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল। আমার মুখে অভয় এবং সান্ত্বনা পেয়ে সে চুপ করল। আমাকে সে ডাক্তার মনে করেছিল। যথারীতি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে দুধ ব্রাণ্ডি খাইয়ে দিলাম। সব সময়েই বাক্সটাতে কিছু ব্রাণ্ডি থাকত। কিছুক্ষণ পরে সে সুস্থ এবং শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সরির কোল থেকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। রক্তমাখা কাপড়খানা ছেড়ে এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে সরি বললে, কি হবে বাবা?

ঘটনাটা এই—

আহত যুবক গোবরার পত্নীস্বস্পতি, বাংলা ভাষায়—স্ত্রীর বোনের স্বামী, সোজা বাংলায়—ভায়রা-ভাই। নাম জংলা। ভাই শব্দের ডবল প্রয়োগে সুভ্রাতৃত্ব সূচিত হয়। গোবরাও সুভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিতে কসুর কিছু করে নি।

গাঁয়ে ব'সে জংলার দিন চলছিল না। জংলা বিপত্নীক। দুটি

ছেলে মেয়ে। তাদের বয়সের যোগফল পাঁচের বেশি হবে না। তাদের একলা ফেলে ভাগে-ভূতে জমি করা বা দিনমজুর খাটতে যাওয়া জংলার পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল। পুনর্বিবাহেও এই সমস্যার মীমাংসা ছিল না, সংমা এসে ছেলেমেয়ে দুটোকে হেনস্তা (হীনস্থ) করবে। তাদের সে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসত।

তার এই অসহায় অবস্থায় করুণাপরবশ হয়ে গোবরা তাকে নিজের বাড়িতে ডেকে এনেছিল। গোবরা যে হাই-মাইণ্ডেড ছোকরা, খুঁটিনাটি ব্যাপারে আগে থেকেই আমার জানা ছিল। বলা বাহুল্য, বাচ্চা দুটোও সঙ্গে এসেছিল। অবশ্য তাদের ব্যয়ভার গোবরাকে দু-একদিনের বেশি বহন করতে হয় নি। তাতে কিছু যায়-আসেনা। এমনিতেই তারা কুটুম্বের অধিকারে দুই-একদিন গোবরার আতিথ্য স্বীকার করতে পারত। এতে লজ্জা বা নিন্দার কিছুই ছিল না।

তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থাও গোবরাই ক'রে দিলে। তার সুপারিশে মহাজনের কাছ থেকে জংলাও একটা রিক্‌শ পেলে।

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয়।

—হেমচন্দ্র যে অর্থে 'মহাজন' শব্দ ব্যবহার করেছেন, এ মহাজন সে মহাজন নয়। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ধনী ব্যবসায়ীকে এরা মহাজন ব'লে ডাকে। অবশ্য শব্দটা আজকাল উভয় ক্ষেত্রেই একার্থক হতে চলেছে।

বিশেষ কিছু বরণীয় না হ'লেও গোবরার পথ লক্ষ্য ক'রে জংলার দিন মন্দ কাটছিল না। মহাজনকে দিনান্তে পাঁচ সিকে পয়সা মিটিয়ে

দিতে পারলে বাকি আয় রিকৃশ-চালকের। নিজের ও দুটি শিশু-সন্তানের খাইখরচ বাবদ গোবরাকে রোজ সে একটি ক'রে টাকা দিত, এক হেঁসেলেই রান্না হ'ত। গোবরা বললে, অত ক্যানে ?

একটা কাঁচি সিগারেট এগিয়ে দিয়ে জংলা বললে, তা হোক।

মা-মাসীতে তফাত কি ? আপাতত সন্তানহীনা গোবরার বউ ছেলেমেয়ে দুটোকে খুব যত্ন করত। জংলাও হাই-মাইণ্ডেড। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ উক্ত পরবধূকে সে ক্বচিৎ একটা সাবান, কদাচিৎ একটা ফুলেল ত্যাল, কখনও বা একটা চিরুনি উপহার দিত। রিকৃশর আয় থেকে সব খরচ মিটিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থাকত।

এই সব নজরে পড়তে গোড়ার দিকটায় গোবরা বরং খুশিই হ'ত। কিন্তু হাই-মাইণ্ডেড ছোকরাদেরও জানা আছে যে, সর্বম্ অত্যন্তং গর্হিতম্। শেষ পর্যন্ত মহাজনের প্রাপ্য বাকি পড়তে থাকে, সংসার-খরচেও টানাটানি পড়ে। একদিন স্পষ্টাক্ষরে তার মাকে বললে, বাড়াবাড়িটা কিছু ভাল নয়। এই সম্পর্কে প্রচলিত শ্লোকাংশও তার অজ্ঞাত ছিল না—অতিদানে হতো লঙ্কা। কিন্তু গোবরা নিজের স্ত্রীকে কিছুই বললে না। উচ্চহৃদয় যুবকদের চক্ষুলজ্জা অত্যন্ত স্বাভাবিক !

কিন্তু জংলার দিকটাও একটু ভেবে দেখতে হবে। সুভ্রাতৃত্ব ছাড়াও গোবরার সঙ্গে তার একটা রসিকতার সম্বন্ধ আছে। তার স্ত্রীর সঙ্গে তো আছেই। এবং এক ধরনের টুকিটাকি রসিকতাও মাঝে মাঝে তার নজরে পড়ত বইকি।

একদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকে গোবরা দেখলে যে, জংলা তার বউয়ের কপালে টিপ পরিয়ে দিচ্ছে। চুল বাঁধা হয়ে গেছে। সম্মুখে আয়না থাকতে টিপ পরবার জন্য পরপুরুষের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, গোবরা-

মাথাতেও এইটুকু বুদ্ধির অভাব ছিল না। সরি তখন ঘুমুচ্ছিল। এবং আর একদিন—

যুবতীর কোমল গণ্ডে মৃদু চপেটাঘাত যুবক ভগিনীপতির পক্ষে, নিছক স্নেহবাৎসল্যের অভিব্যক্তি নয়। সরি সেদিন বাড়িতে ছিল না। এবং অপর একদিন—

এক পক্ষের আঁচল ধ'রে টানাটানি এবং অপর পক্ষের খিলখিল হাসির সঙ্গে 'আঃ ছাড়ো, ছাড়ো' গোবরা স্বচক্ষে দেখেছে এবং স্বকর্ণে শুনেছে। সরি গিয়েছিল কাপড় কাচতে।

এই সব অভিযোগ সরির কানে পৌঁছেছিল, কিন্তু সে তাদের এঁটে উঠতে পারে নি। পাড়াপড়শীদের ভিতরেও কানাঘুষা চলছিল। অবশেষে হাই-মাইণ্ডেড গোবরা নির্জনে ডেকে জংলাকে একদিন শাসিয়ে দিলে। জংলাও উচ্চহৃদয়। উচ্চহাস্যে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, উ তো আমার বুন ব্যাটে।

জংলা কতকটা নিশ্চিন্ত হ'লেও তার মুখে এই কথা শুনে সরি কিন্তু বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। বলেছিল, নজর রেখতে হবে।

নারীচরিত্র সম্বন্ধে গোবরার গাম্ভীর্যপূর্ণ মনোভাব আপনাদের অবিদিত নয়। বউকে সে একটি কথাও বলে নি।

খুব সম্ভব, সেদিন সন্ধ্যায় জংলার সহজ সরল রসিকতা একটু জংলী ধরনের হয়েছিল এবং তা সতর্ক গোবরার নজরে পড়েছিল। হাতের পাকা বাঁশের লাঠিটা সে সজোরে জংলার মাথায় বসিয়ে দিলে।

এই সব কথা সরি সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ ক'রে দিলে। গোবরা পলাতক। বউটাকে দেখতে পাই নি। এর বিচার পরে হবে—এই কথা ব'লে হৈ-চৈ করতে কিংবা থানায় খবর দিতে বারণ

ক'রে এবং আর একবার আমার ঘুমন্ত রোগীর নাড়ি দেখে আমি বাসায় ফিরি।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, গোবিন্দলাল রোহিণীকে গুলি করছে।

হা ভগবান! এও আমার অদৃষ্টে ছিল! শেষ পর্য্যন্ত ডিটেক্‌টিভ নভেল লিখতে হবে না কি?

১৬

পরদিন সকালবেলা। গ্রন্থাবলী পড়া বন্ধ ক'রে কবি অতীশের গদ্যকবিতার বই 'ভাম্পায়ার'খানা খুলে বসেছিলাম। বেশ লেখা।

ভস্ ভস্ ভস্ ভস্ ভস্ ভস্—শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আমার বাইরের ঘরের বারান্দায় এসে থামল। তারপর ক্রমাগত পু-উ-উ-উ—মনুষ্যকণ্ঠে বংশী ধ্বনির অনুকৃতি, দম নিতে শুধু মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্যে থামতে হচ্ছিল। ব্যাপার কি? দরজা খুলতে নজরে পড়ল—লিটল্ লিলিপুট এক্সপ্রেস—একটি দশ বছরের ছেলে! তার ধারণা, সে ইঞ্জিন হয়ে গেছে, কয়লাবিহীন নিষ্কলঙ্ক নির্ধূম···এনার্জির অক্টোপাস্!

সিগ্‌ন্যাল পড়ে নি, ইঞ্জিন আসে কি ক'রে? আমাকে দেখে কিন্তু ইঞ্জিন নিজেই সিগ্‌ন্যাল হয়ে গেল। দুটো হাত মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে তুলে একটা হাত নামিয়ে দিলে।

হেসে বললাম, এস ইঞ্জিন, ভেতরে এস।

ইঞ্জিন এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। গম্ভীরমুখে শার্টের বুক-পকেট থেকে একটা চিঠি বের ক'রে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে। ফের বাঁশী বাজল। ইঞ্জিনের চাকার সঙ্গে যে হাতল জোড়া থাকে, হাত

ছুটো সেইটার অনুকরণে ন'ড়ে উঠল। তার পর পু-উ-উ, ভস্ ভস্ ভস্ ভস্—শব্দটা ক্রমে বেড়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

এক মিনিটও অপেক্ষা করলে না। কেমন ক'রে করবে? হয়তো অপর একটা জংশনে অন্য কোনও গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, দেরি করলে মিস করবে যে! একটু এদিক-ওদিক হ'য়ে কলিশনও হতে পরে।

টেবিল থেকে চিঠিখানা তুলে নিলাম। একখানি খোলা চিঠি—

খামের ভিতর আটকানো নয়⋯অতএব
প্রাণখোলা চিঠি একে বলতেই হবে।
ছন্দবিহীন প্রাণের স্পন্দন,
যেন আধুনিক গদ্য-কবিতা,
কোথাও সামঞ্জস্য আছে এবং অন্যত্র তা নেই।
অশিক্ষিতা অপরিচিতার চিঠি,
অপ্রত্যাশিত মাতৃস্নেহের অতিশুদ্ধ আদিম অভিযান।
লিখছে :
আমি তার ছেলের যখন দাদু,
তখন তার হাতের রান্না আমায় খেতেই হবে—
অসার অকাট্য যুক্তি। নিরালম্ব লজিক।
এ যেন বজ্রবিপদ এবং ঝড়ঝঞ্ঝাটের পর
অশ্রুসিক্ত বৃষ্টিধারার দান।

বুঝতে দেরি হ'ল না 'কে বা কাহাদের' প্ররোচনায় চিঠিখানার সৃষ্টি। বুঝতে দেরি হ'ল, ইঞ্জিন স্টেশন এবং স্টেশন-মাস্টারকে চিনল কেমন ক'রে! বোধ হয় ঝঞ্ঝা কিংবা বিপদ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। স্টেশনটার বৈশিষ্ট্য তার গাঁদাফুলের বন (এখন আর বাগান বলা চলে

না, যত্নাভাবে অন্যান্য ফুলের গাছ ম'রে গেছে)। সুবিস্তৃত টাক, স্বকীয় এবং সাদা দাড়ির দৈর্ঘ্যে স্টেশন-মাস্টার এ পাড়ার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এত সব সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান থাকতেও স্টেশন এবং স্টেশন-মাস্টার চিনতে পারবে না, সে কেমন ইঞ্জিন ?

'ভাম্পায়ার' পাঠে মনোনিবেশ করি। নীচের কবিতাটি আমার এবং সমরসজ্জ আরও অনেকের ভাল লাগবারই কথা—

চা !
ইউক্লিপটাসের দেশ হতে হয়তো,
অথবা ক্যাক্টাসের জঙ্গল হতে
কুড়িয়ে আনা পাতা,
তা ছাড়া আর কিছুই নয়—
তবু যেন বাষ্পের বিসুবিয়স !
আমার প্রিয় চা !
সসারে চা ঢেলে খেতে আমি ভালবাসি না,
ঠাণ্ডা চা—
যেন ক্যালাস—বার্ধক্য !
আমি চাই কাপ হতে লিপ এবং লিপ হতে কাপ—
আমার প্রিয় চায়ের পেয়ালা :
প্রখর অনিবার্য চুম্বন !

পড়তে পড়তে এবং গদ্য কবিতার টেক্‌নিক ভাবতে ভাবতে বেলা হয়ে গেল। কটা বেজেছে ? কে জানে !

ক্লকটার দিকে চেয়ে দেখি,
মোটেই নড়ছে না তার পেণ্ডুলাম।
রিস্টওয়াচটা তুলে ধরি চোখের ওপর,

প্রায় দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রেও
পাঁচটা বাজতে পনরো মিনিট।
বুঝতে দেরি হ'ল না,
রাত্রির যবনিকা তখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে অপসৃত হয় নি,
আলো-ছায়া এবং নিদ্রা-জাগরণের মিষ্টিক কুজ্ঝটিকার অন্তরালে
স্তব্ধ হয়ে গেছে তার টিক-টিক-টিক।
দ্রুত দুর্বল অনিশ্চিত পদক্ষেপ—
সূক্ষ্ম তারে এবং ছোট্ট চাকায় আবদ্ধ
অবিশ্বাসী অতিক্ষীণ নিশ্বাস!

বুঝলাম, আধুনিকতার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে আর চলতে পারছি না। আর আমার পক্ষে আজকাল তার দরকারই বা কি? যাদের সঙ্গে মিশতে হ'লে ঘড়ি ধ'রে চলতে হয়—

হ্যাঁ, ঘড়ি না দেখেও মোটামুটি কাজ চ'লে যায়। রৌদ্রের তেজ দেখে বুঝতে পারি, বেলা প্রায় দশটা। তাড়াতাড়ি যথাকর্তব্য সেরে ফেলি। ভদ্রলোকেরা আমার জন্যে ব'সে থাকবেন। হিন্দু-পরিবারে পুরুষদের খাওয়া না হ'লে মেয়েদের অসুবিধার অন্ত থাকে না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে যখন দেখলাম, কারও আসবার লক্ষণ নেই তখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ি। আমার সম্বল ছিল নগীর ইঙ্গিত, সামনের রাস্তা ডাইনে রেখে সাতখানা বাড়ির পর। আমার কর্তব্য নিমন্ত্রণরক্ষা, অসম্ভব হ'লে না হয় ফিরে আসব। রাস্তায় এসে খটকা লাগে, গোনবার সময় আমারটাও ধরব কি না? যাই হোক বাদ দিয়েই গুনে চলি—এক, দুই, তিন সপ্তমদ্বারে পৌঁছে দেখি, একটা একতলা বড় বাড়ি। বাড়িখানা বহুদিন হ'ল তার যৌবনসীমা অতিক্রম করেছে, বার্ধক্যে না হোক, প্রৌঢ়দশায় পা দিয়েছে। সম্প্রতি চুনকাম

করা হয়েছে—পাকা চুলে কলপের ঠিক উল্টো দিক। তার সামনের ঘরে দরজার পাশে ব'সে আছেন

আমার টেকো-বন্ধুর দাদা।
তাঁর মাথায় টাক ছিল না···কিন্তু,
ইনি যে তাঁরই সহোদর তা বুঝতে দেরি হ'ল না।
অতএব :
নূতন ক'রে রূপবর্ণনা অনাবশ্যক !
সেই গালভরা হাসি—এবং
হেসেই শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে
আমায় অভ্যর্থনা করলেন !

বললেন, আসুন আসুন। আমি আপনার অপেক্ষাতেই ব'সে আছি! কর্মকর্তার মুখভাব নিয়ে, চেয়ারটা তুলে তাঁর মনোমত জায়গায় এবং আমার হাত ধ'রে সেই চেয়ারটায় বসিয়ে দিলেন।

আমি তার ঠাণ্ডা-কঠিন দারুময় বক্ষে আশ্রয় নিলাম।
অ্যারিস্টোক্র্যাটিক কুশান কিংবা গদির সঙ্গে
কোনদিন তার কিছু পরিচয় ছিল না
শুষ্কং কাষ্ঠং—
মৃতবৃক্ষের অস্থিপঞ্জর হতে নির্মিত
অবিমিশ্র কৃত্রিম অবয়ব।

একটু নড়তে চড়তেই দুলতে থাকে—অনেকটা অটোমেটিক।

এবং তিনি বসতেন বিনীতভাবে নিকটস্থ তক্তপোশে। সেটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ ক'রে আর্তনাদ ক'রে উঠল।

অল্প আলাপেই জানিয়ে দিলেন, তাঁদের এটা জয়েণ্ট ফ্যামিলি।

তিনিই বাড়ির বড়কর্তা। তাঁরা তিন ভাই—জ্যেষ্ঠাদিক্রমে তাঁদের নাম—মনোহর, নরহরি এবং মধুসূদন।

মধুসূদন! আমার মনে ভাবোদয় হ'ল—
বিশ্বরূপের বিভীষিকা দেখে সেদিন আমি ডেকেছিলাম,
হে বিপদতারণ মধুসূদন···
এবং সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনবাবু গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।
আমার জীবন-কাব্যে এমন সুন্দর মিল আর কখনও হয় নি।

তার পর আর সকলের পরিচয় দিলেন। তাদের বর্ণনা কিছু কিছু আমি আমার "বিশ্বরূপ-দর্শন" অধ্যায়ে করেছি। বাকিটার যতটুকু দরকার, এর পরে পাওয়া যাবে।

তিনি গল্প করছেন, হঠাৎ ঘরে ঢুকে ইঞ্জিন তাঁর কোল ঘেঁষে বসল সাধারণ ভদ্রলোকের মত, কারণ এখন সে আর ডিউটিতে নেই। মনোহরবাবু জানালেন, তিনিই ইঞ্জিনের জন্মদাতা এবং এইটিই তাঁর শেষ সন্তান। ভদ্রলোক আমার সমবয়স্ক, এবং পূর্বেই বলেছি—ইঞ্জিনের বয়স দশ। বললেন, দাও তো ইঞ্জিন, তোমার কবিতাটা শুনিয়ে। দেখা গেল, এরাও তাকে 'ইঞ্জিন' ব'লে ডাকে।

কথাটা শুনেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাতল দুটো ন'ড়ে উঠল, তারই গতিবেগের সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে—

ভোঁশ ভোঁশ ফোঁশ ফোঁশ
ইঞ্জিন করে আপসোস—

সবটা আমার মনে নেই। ভাবটা এই: ইঞ্জিন বলছে, ফন্দি ক'রে মানুষ আমাকে রেল-লাইনে বন্দী ক'রে রেখেছে, অহোরাত্র ভার বইয়ে খাটিয়ে নিচ্ছে। সে স্বাধীনতা মানুষ ভোগ করতে চায়, পরকে তা

দিতে কুণ্ঠিত—মানুষের এই স্বভাব। ইঞ্জিনকে সান্ত্বনা দিয়ে শেষের দিকে কবি বলছেন—

চুপ কর ইঞ্জিন
তোমার এসেছে দিন—

মানুষের ক্ষীণদৃষ্টি তোমাকে সৃষ্টি ক'রে ভেবেছিল, তোমাকে চির-পরাধীন রাখবে। এতদিনে ঋণ পরিশোধের সময় এসেছে। হে দানবরাজ!

ধরেছ যে রণসাজ
তোমা হতে হ'ল আজ
মানুষের দশা সঙ্গীন!

তার আবৃত্তি শুনে এবং অভিনয় দেখে—

আমি তাকে সম্বর্ধিত করতে উঠে যেতেই
ওর দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে নিবদ্ধ করলে—
স্বচ্ছ বড় বড় চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'ল।
তারপর হাঁ ক'রে বাইরে থেকে খানিকটা হাওয়া
ওর ক্ষুদ্র ফুসফুসে পুরে নিতেই—
হাতল দুটো ন'ড়ে উঠল। এবং তৎসঙ্গে—
পুঁ-উ-উ-উ…ভস্ ভস্ ভস্…
খুব সম্ভব, ফের ডিউটির সময় হয়েছে।

ইঞ্জিন চ'লে গেল। কি ভেবে 'ইঞ্জিনিয়ার' চাদর-ঢাকা ছোট টেবিলটা আমার সম্মুখে টেনে আনলেন। টেবিলে ছিল দোয়াতদানি, কলম, রাইটিং প্যাড—তাতে ছিল বহুব্যবহৃত ব্লটিং পেপার, সেদিনের সংবাদপত্র এবং একটা চীনামাটির ছোট প্লেটে রক্ষিত কয়েকটি সিগারেট, একটি দেশলাই, প্রচুর বিড়ি। শেষোক্ত দ্রব্যগুলিতে

আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ও সংবাদপত্রখানা এগিয়ে দিয়ে তিনি ভিতরে চ'লে গেলেন।

আগেই বলেছি, আমার 'নিজস্ব' সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ ছাড়া আর কিছুই আমি পড়ি না। উক্ত সংবাদপত্রে নিয়মিত একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছি বহুদিন যাবৎ, আজ পর্যন্ত তার উত্তর মেলে নি।

একটা সিগারেট ধরাই। টেবিল-ক্লথের সূচীশিল্প প্রশংসনীয়। কাজটা দো-রোখা কিনা পরীক্ষা করতে কাপড়টা খানিক উল্টে দেখি। না, দো-রোখা নয়, এক-রোখাই, কিন্তু টেবিলটা কেরোসিন-পাটার।

মধ্যবিত্ত হিন্দু ফ্যামিলি!
দারিদ্র্য ছাড়া এদের কোনও গোপন কথা নেই—
সর্বত্র এই দারিদ্র্যকে ঢেকে রাখবার 'আপ্রাণ' প্রচেষ্টা!
ভাঙা বাড়িকে বছর বছর পূজার সময়
হোয়াইটওয়াশ করতে অবহেলা করে না—
বার্নিশ-করা নড়ব'ড়ে চেয়ার—
জাজিম-পাতা ক্যাঁচকেঁচে খাট,
চাদর-ঢাকা কেরোসিন-পাটার টেবিল।
নিজেরা বিড়ি-তামাক খায়,
অতিথিকে খাওয়ায় সিগারেট।

গদ্য-কবিতার টেক্‌নিকের সঙ্গে সঙ্গে এই সব কথা ভাবছি, ব্যতিব্যস্তভাবে ঢুকলেন মধুসূদনবাবু। তাঁর দু চোখ কপালে উঠেছে। মুখে হাসি টেনে নমস্কার ক'রে বললেন, এই যে, দাদা এসেছেন। না ডাকতেই এসেছেন! তা তো আসবেনই। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আর মান-অভিমান কি! আর হয়ে এসেছে। আপনার ছোট

বউমাটি (অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী) বড় রোগা কিনা! নগীও এদিকে আসতে পারে নি। বড্ড বেলা হয়ে গেল। আপনাকে কষ্ট দেওয়া হ'ল শুধু শুধু। চলুন, ভেতরে চলুন।

তিনি ক্রমাগত ব'লে যাচ্ছিলেন, আমি শুধু ঘাড় নাড়ছিলাম এইবার তাঁর নির্দেশক্রমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই।

যেতে যেতে সাবধানে চারদিক চেয়ে গলা খাটো ক'রে বলতে লাগলেন, আর দেখুন দাদা, নগীর কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না। ওর কথা, ওর কাজ আমরা কেউ গায়ে মাখি না। আহা—

ঢাকতে চেষ্টা ক'রেও তিনি প্রকাশ ক'রে ফেললেন, প্রথম জীবনে স্বামী-পরিত্যক্তা নগী! ঈশ্বরদত্ত অপরাধে। অবশ্য, কেশবিরল মস্তক টাইফয়েডের ফল। ফ্রয়েড কি বলেন?

তাঁর পিছু পিছু ভিতরে ঢুকলাম। একখানি পরিপাটী ঘর, মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের সেই একই ইতিহাস—বাইরে নিখুঁত চাকচিক্য, অন্তরে অসীম দৈন্য। দেখে সহজেই অনুমান করতে পারি কতখানি গায়ের রক্ত জল ক'রে এর সৌন্দর্যসাধন করা হয়েছে।

এক কোণে ঈজি-চেয়ার পাতা ছিল একটা, তার কোলে গা ঢেলে দিলাম। 'ওদিককার ব্যবস্থা' দেখতে মধুবাবু চ'লে গেলেন।

কর্মব্যস্ত নগী এসে বললে, তোমার ভারি কষ্ট হ'ল দাদা! তা কি করব বল! মেজদার সেজো ছেলেটার জ্বর এসেছে, দেখতে না দেখতে একশো পাঁচ। মাথায় জল ঢেলে একশোতে নামিয়ে তবে আসতে পেলাম। খুব অসুবিধে হ'ল তোমার।

আমি বললাম এবং সত্য কথাই বললাম যে, আমার কোনও কষ্টই হয় নি। চা খেতে প্রায়-দিনই একটা বেজে যায়। কিছু তাড়া নেই। নিঃসঙ্কোচে বলি, বরং তোমাদের শেষ হতে হতে একটু

চা যদি—। স্টোভ এবং চায়ের সরঞ্জাম নেই ঘরেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

ঐ দেখ! ছোটদার যদি কোন-কিছুতে খেয়াল থাকে! চিৎকার ক'রে উঠল, এই মীরা! এদিকে আয় শীগগির! জোরে জোরেই বলতে লাগল, ঐ এক রকম লোক! যেমন কথাবার্তা, তেমনি কাজ! ছোটদার ব্যাপারে তুমি কিছু মনে ক'রো না দাদা। নিম্নকণ্ঠে বললে, সম্মুখে কন্যাদায় ভালমানুষ লোক, কি করবে, কি ক'রে কি হবে—কিছুই যেন ভেবে ঠিক করতে পারছে না। আরও যেন হতভম্ব সেজে গেছে।

মীরা ঢুকতেই বললে, তোর নতুন দাদুকে চা ক'রে দে! এই ব'লে ব্যস্তভাবেই বেরিয়ে গেল।

একটি ঋজু শ্যাম লজ্জাবতীর লতা আমার পায়ের ওপর নুইয়ে পড়ল। ওকে আমি কি আশীর্বাদ করব? ভাল বর হোক? তা ছাড়া আর কি হতে পারে? ওর বাপের অবস্থা স্মরণ করি। আমার আশীর্বাদকে সফল করতে হ'লে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা আমাকেই দিতে হয়। কিন্তু গোটা বাংলা দেশে এর মত অনূঢ়া কন্যার সংখ্যা এত বেশি যে, তাদের সকলের সদ্‌গতি করতে হ'লে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনবান স্টেটকেও ফেল পড়তে হয়! অগত্যা মনে মনে ধ্যান করি, প্রজাপতয়ে নমঃ।

পাঁচ মিনিটে চা তৈরি হ'ল। স্টোভ, পেয়ালা, পিরিচ, চামচে, চা এবং চিনির কৌটো কেউ কিছু শব্দ করলে না—স্টোভটার নিজস্ব যান্ত্রিক নির্ঘোষ ছাড়া। একটু চিনি, একটু চা মেঝেতে পড়ল না। পরিপূর্ণ একটি কাপ চা, পেয়ালার চা উপচিয়ে পড়ল না পিরিচে। চুমুক দিয়ে দেখি, দুধ চিনি এবং লিকারের অপরূপ সামঞ্জস্য। জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামিলীর এই অংশের গৃহিণী রুগ্না, রন্ধনাদি ক্রিয়া প্রধানত নগীর

দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অতএব প্রমাণ পাওয়া গেল, কক্ষটির এই পরিচ্ছন্নতা কার হস্তনৈপুণ্যের ফল।

জিজ্ঞাসা করি, কি বই পড় ?

লজ্জায় জবাব দিতে পারলে না। চোখ দুটি মাটির দিকে নেমে আসে। পরে চোখ তুলে বইয়ের শেল্‌ফ্‌টার দিকে তাকায়।

ওকে আর বিব্রত করতে ইচ্ছা হ'ল না। পিঠময় ছড়ানো রেশমের মত নরম একরাশি চুলের গায়ে হাত বুলিয়ে বললাম, যাও, তোমার মার কাছে যাও।

মীরা চ'লে গেল। নরম মাটির ওপর আঙুল দিয়ে আঁকা রেখার ওপর দিয়ে জল যেমন ক'রে এঁকেবেঁকে যায়।

শেল্‌ফের একটা তাকে এক রকমের অনেকগুলি নূতন বই সাজানো ছিল। একখানা টেনে নিয়ে এসে পূর্বস্থানে বসি।

বইটার মলাটে লেখা ছিল—'মাটির কোলে আমরা'। লেখক—শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী বি, এ। বইখানা ভূগোল। কয়েক পৃষ্ঠা প'ড়ে ফেলি। এমন সরল ভাষায় লিখিত নূতন ধরনের ভূগোল আর কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নি। আশ্চর্য, পাঠ্যতালিকায় স্থান পায় নি এবং অবিক্রীত প'ড়ে আছে।

নগীর ছোটদা একজন স্কুলমাস্টার, উচ্চশিক্ষিত এবং পুস্তক-লেখক। উপন্যাসলেখক হতে যাচ্ছি, অথচ এ কথা আমি ধারণাও করতে পারি নি। আমার দোষ নেই, তাঁর চালচলন দেখে কারও পক্ষে তা সম্ভব হ'ত না।

কৌতূহল বাড়ল। মীরার বইয়ের শেল্‌ফটার কাছে উঠে গিয়ে একখানা বই খুলে দেখি, তার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে—মীরা দেবী, ফার্স্ট ইয়ার ক্লাস,...কলেজ।

বুঝলাম, এই সব তাদের চেষ্টাকৃত নয়, অভিনয়ও নয়। শিক্ষার ফলও নয়, আদর্শও নয়। এদের দারিদ্র্য-কুণ্ঠিত জীবনে শিক্ষার গৌরব চাপা প'ড়ে গেছে। গর্ব-অহংকারের কথাই ওঠে না।

শূন্যমনে বইখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, হঠাৎ কানে ঢুকতেই চমকে উঠি একটা পরিচিত শব্দে—তাদ্দাঃ!

শ্রীমান বিশ্বরূপ!
স্তূপীকৃত বিছানাপত্রের অন্তরালে
প্রভু যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন,
আমার পাপচক্ষু এতক্ষণ তা নিরীক্ষণ করে নি।
নিদ্রাভঙ্গে চোখ কচলিয়েছেন,
চোখের কাজলে সমগ্র মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত!
একটি রঙ-বেরঙের ছোট লাঠি হাতে নিয়ে যোগস্থ ছিলেন,
এখন উঠে বিছানার উপর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে,
সেই হাতের পাচনি আমার দিকে প্রসারিত ক'রে বলছেন:
তাদ্দাঃ!

আমি তাকে কোলে তুলে নিতে উঠতে যাচ্ছি, চক্ষের নিমিষে ঘরে ঢুকে মীরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে চ'লে গেল, পাছে আমাকে বিরক্ত করে।

চুপ ক'রে ব'সে আছি। দ্রুতবেগে নগীর পুনঃপ্রবেশ। বললে, দেখে-শুনে নিও দাদা। এ তোমারই বাড়ি। ছেলেটার আবার কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে।—এই ব'লে সবেগে প্রস্থান।

বাড়িটা পূব-মুখো। দক্ষিণ দিকের অংশ থেকে অর্গানের বাজনা বেজে উঠল। উত্তর দিক থেকে কাটা কাটা কথা আমার কানে ঢুকছে—জোরে জোরে বাতাস কর্। জলপটিটা ভিজিয়ে নাও। ওরে, কে

আছিস, আর এক বালতি জল এনে রাখ্ এই ঘরে। এবং সেই সঙ্গে অর্গানে নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—জানিতে যদি গো তুমি। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ চিৎকার—এই শোভা! বাজনা থামা। আমি একা ব'সে ব'সে ভাবছি—

জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামিলি!
একই ছাদের তলায় মস্ত বড় পরিবার—
অসংখ্য লোকজন। ভিচিকিচির ওম্‌নিবাস।
ভিতরে তার বহুবিধ পার্টিশান,
পৃথক পৃথক হিস্যা—
ঈর্ষা, কলহ, মতদ্বৈধ নিশ্চয় আছে—
এবং তাই নিয়েই তাদের দৈনন্দিন জীবন হয়তো।
কিন্তু :
'বিপদে—
শত্রুর বিরুদ্ধে—
উৎসবে এবং পরের সঙ্গে সৌজন্যে ওরা জয়েণ্ট ;
আর জয়েণ্ট প্রপার্টি এই বাড়িখানা, এবং
বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে ছোট শিশু—বিশ্বরূপ!
ইণ্টারেষ্টিং খেলনা হিসাবে ও সবারই কাছে পায় সমান আদর।
একান্নবর্তী হিন্দু পরিবার!
একটা বিরাট পুষ্করিণী—
শ্যাওলা শালুক পানারি আর পদ্মপাতায় ঢাকা—
ফুলও ফোটে তাতে—
তলায় বজবজে পাঁক!
বুকের ভিতর অজস্র জলজন্তু খাদ্যের খোঁজে কিলবিল করছে—

প্রায়-অস্ত্রহীন নিরীহ সব জীব—
কাতলা, পুঁটি, চ্যাং, ব্যাং, কাঁকড়া, গুগলি, ঢোঁরসাপ…
এবং তাদের ছোটবড় ছানাগুলি।
জলকেউটে? তাও হয়তো থাকে কোনটায়—
কিন্তু এখনো আমি তার পরিচয় পাই নি।
জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামিলি!
এ বরং অনেক ভাল যে—
দারিদ্র্য ভিন্ন তাদের কোনও সমস্যা নেই—আর নেই:
না বলতে পারার মত না-বলা বাণী!
একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার: ওরা বলে—
শুধু সুবিধার জন্য অন্ন-পরিবেশনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা।
স্বার্থে স্বার্থে প্রচুর সংঘাত—
পরার্থে শুধু গাল-ভরা নাম—'জয়েণ্ট'।

মধুসূদনবাবু এসে আমাকে এই অনাবশ্যক দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করলেন। উপন্যাসের পক্ষে অনাবশ্যক, কারণ বাড়িখানাকে উদ্দেশ ক'রে স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে, সারা শহরে 'তুমিই তোমার মাত্র তুলনা কেবল'। মধুবাবু বললেন, আসুন দাদা, জায়গা হয়েছে।

পাশাপাশি দুটি আসন পাতা। একটাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি। মধুবাবু গেছেন রান্নাঘরের ভিতর। তিনি না আসা পর্যন্ত বসতে পারছি না। কিন্তু তাঁর বদলে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাথায় আধ-ঘোমটা কাপড় দিয়ে, আঁচলের খুঁটটা গলায় জড়িয়ে, একটু দূর থেকে প্রণাম করলে—

একখানি চামড়া-ঢাকা জীর্ণ কঙ্কাল! গায়ের রঙ? বলতে পারব না। ও যখন বধূবেশে প্রথম এই বাড়িতে আসে, তখন তার চেহারা

কি রকম ছিল, আমি কেন, কোনও কবিই তা বলতে পারবে না। কোনও বিজ্ঞ চিকিৎসকও না। কষ্টে হেসে বললে, আপনাকে আমি কি খাওয়াব, আমার কি আছে?…তবু আপনি এসেছেন…শুনলাম… নিজের থেকেই এসেছেন…

খাওয়া-দাওয়া হ'ল। তার আয়োজনের ভিতরেও বিলাসের আবরণে দারিদ্র্য লক্ষিত হ'ল—দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। আমি ভাল ক'রে খেতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম। ঐ হাড় কখানার ভিতর হৃদয় ব'লে কোনও বস্তু যদি আজও থাকে, তাকে নূতন ক'রে পীড়িত করতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না।

কটা বাজল? দরকার কি জেনে? ফেরবার সময় মনে হ'ল, আমি যেন এক দুর্দান্ত ক্ষুধার্ত শিশু, মাতৃস্তন্য টেনে চুষতে গিয়েছিলাম, বেরিয়ে এল রক্তমাংস—তাতে দুধ নেই। ভাবতে আমার সমস্ত মন ঘিনঘিন ক'রে উঠল।

নগী বড় মিথ্যাবাদী! হায়, ওরই কথা শুনে চলেন তার ছোটদা? বরং তার উল্টো দিকটাই সম্ভব—সকলের কথা শুনে চ'লে সবার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আজ ওর এই দশা।

গৃহকর্তার কর্তব্য সেরে সেই যে স'রে পড়েছিলেন, মনোহরবাবুর আর দেখা পাই নি। নরহরিবাবুর তো একেবারেই না।

আর দেখা পেলাম না তার, যার নিমন্ত্রণে আমি এখানে এসেছিলাম—বিশ্বরূপের মা যশোদার। কে সে? কার পুত্রবধূ? সধবা, না, বিধবা? এই নিষ্প্রয়োজন ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর চিরকালের জন্য অজানা র'য়ে গেল।

১৭

হ্যাঁ, এই বাড়িটা থেকে প্রচুর উপকরণ পাওয়া যেতে পারে। নগীর বিবাহিত জীবনের ইতিহাস, মীরার ভবিষ্যৎ জীবন এবং অর্গানের বাজনার ছিদ্রপথে প্রবেশ ক'রে ছিদ্রান্বেষী চতুর ঔপন্যাসিক লোকচক্ষে অনেক কিছু তুলে ধরতে পারেন। সমগ্র পরিবার অবলম্বন ক'রে লিখলে, সেটা হবে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড—ভীষ্মপব্ব, দোরোন-পব্ব ইত্যাদি। পৌরাণিক না হ'লেও ঐতিহাসিক—'জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামিলি' বাংলা দেশে আজ অতীতের ইতিহাস মাত্র। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস আজকাল বড় একটা কেউ পড়তে চায় না।

যতদিন বাপ-মা বেঁচে থাকে, ভয়ে-ভক্তিতে জোড়াতালি দিয়ে কোনও ক্রমে চলে, কখনও সম্পত্তির লোভে (যদি কিছু থাকে), কখনও বা স্নেহের আওতায় (যদি তার তোয়াক্কা রাখে)। এবং দুঃখের বিষয়, এই দুটো জিনিসের অভাবে উকিল-গিন্নীর ভারবাহী নৌকাখানা কয়েক মাসের মধ্যে হালকা হয়ে গেছে।

সেদিন সকালবেলায় উকিল-গিন্নী নিজে এসে বললেন, আজ সন্ধ্যেয় একবার আমাদের বাড়ি এস ভাই, গোটাকতক কথা আছে। খুব জরুরি কথা, উনিও যেতে বলেছেন। যেয়ো কিন্তু। এই ব'লে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন। সদাহাস্যময়ী উকিল-গিন্নীর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া—দেহের দিক থেকেও হালকা হয়ে গেছেন।

উকিলবাবু এবং উকিল-গিন্নীর 'গোপন কথা'! ব্যাপার কি? সারাদিনটা ঔৎসুক্যে কাটল। উদ্বেগ? তাও কতকটা ছিল বইকি। পাড়াপড়শী।

তখনও ঠিক সন্ধ্যা হয় নি। বাড়িখানা প্রায়ান্ধকার। বৈঠকখানায় মক্কেল নেই। কয়েকবার কড়া নাড়তে, লণ্ঠন হাতে উকিল-গিন্নী বৈঠকখানার দরজা খুললেন। ম্লানহাসি হেসে বললেন, এস ভাই, ভেতরে এস। তাঁর পিছু পিছু ভিতরে ঢুকি। বিরাট বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। একটা ঘরে উকিলবাবু শয্যাশায়ী। টেবিলের উপর একটা মোমবাতি জ্বলছিল। একটু আগেই ধরানো হয়েছে। শিয়রের কাছে শূন্য চেয়ারটার দিকে চাক্ষুষ ইঙ্গিত ক'রে ক্ষীণকণ্ঠে উকিলবাবু বললেন, ব'স ভাই। লণ্ঠন হাতে উকিল-গিন্নী চ'লে গেলেন।

প্রায় দু মিনিটের নীরবতা ছিন্ন ক'রে উকিলবাবু বললেন, আমরা এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি ভাই। এতদিন এই শহরে বাস করছি, তোমার মত নিরুপদ্রব পরোপকারী ভদ্রলোক একটিও আমার নজরে পড়ে নি। আর আছেন ডক্টর রায়, কিন্তু তাঁকে আমি তুচ্ছ বিষয়ে বিরক্ত করতে চাই না। একটা কাজের ভার তোমাকে আমি দিয়ে যাচ্ছি। এই বাড়িটায় ভাড়াটে আসবে পয়লা থেকে। আজ পঁচিশে। এই কদিনের ভেতর আমাদের চ'লে যেতে হবে। চাবিটা তোমার কাছেই থাকবে। যিনি আসছেন, তাঁকে আমি সেই কথা ব'লে দিয়েছি। ভাড়ার টাকাও তোমাকেই দেবেন।

বুঝলাম, ভাড়ার টাকাটা মাস মাস আদায় ক'রে ওঁদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে। বুঝলাম না, এ কাজের জন্য আমার মধ্যস্থতার প্রয়োজন কি ছিল, ভাড়াটেই তো পাঠিয়ে দিতে পারত। এবং বুঝলাম না অনেক কিছুই। কৌতূহল দমন ক'রে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?

দেশে। ঠিকানা দিয়ে যাব। চোখ নামিয়ে সসংকোচে বললেন, তোমাকে বলতে আমার লজ্জাও নেই, সংকোচও নেই, না-ব'লেও

উপায় নেই। ডক্টর রায়ের কাছে আমার কিছু দেনা আছে। আমার বর্তমান অবস্থা খুলে ব'লে কিস্তি চাইলাম। তিনি হ্যাণ্ডনোটখানাই ফেরত দিতে চাইলেন। আমি নিলাম না। ইতিমধ্যে তিনি এক কাণ্ড ক'রে বসেছেন।—এই ব'লে বালিশের তলায় হাত চালিয়ে একখানা ছেঁড়া খাম আমার হাতে দিলেন। রেজেস্টারি খাম।

টেবিলের কাছে উঠে গিয়ে মোমবাতির আলোতে প'ড়ে দেখি, ডক্টর রায় লিখছে—

অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক হয়েও ব্রহ্মহত্যার কারণ হতে পারি না। আপনার গুরুতর হার্টের অসুখ। এই হ্যাণ্ডনোটখানাই আপনার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অতএব—

আপনার
প্রভাতরবি রায়

চিঠিটুকুর সঙ্গে হ্যাণ্ডনোটটা আলপিন দিয়ে আঁটা। ফিরে এসে চেয়ারে বসি। উকিলবাবু বললেন, ওটা তোমার কাছে রাখ। হ্যাণ্ডনোটটা ফিরিয়ে দিতে চেয়ে ডক্টর রায় বলেছিলেন, যখন যা দিতে পারেন দেবেন, ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ভাড়ার টাকা পঞ্চাশ। ওর থেকে প্রতি মাসে পঁচিশটা টাকা ডক্টর রায়কে দিও, বাকিটা মনি-অর্ডার খরচ কেটে নিয়ে আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও। যতদিন না শোধ হয়।

সখেদে ব'লে চললেন, কথা বেচেই খাওয়া, পেটের দায়ে সত্য-মিথ্যা অনেক কিছু বলতে হয়েছে। কিন্তু জীবনে কাউকে কখনও বঞ্চনা করি নি। ঋণ রেখে মরতে চাই না।…এইটুকু তুমি করবে?

আমি আমার সম্মতি জানাই। নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে বললেন,

কাজের কথাটা বলা হ'ল। বাকি সব গিন্নীর কাছে শুনতে পাবে। আমি একটু ঘুমোব। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যেয়ো ভাই।

ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে বাইরে এসে দরজা ঠেসিয়ে দিলাম। রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। রান্নাঘরের সামনে গিয়ে ডাকি, দিদি!

ভিতর থেকে বললেন, ব'স ভাই, বারান্দায় মোড়া আছে। আমি এলাম ব'লে। অনেক কথা আছে। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন। তাঁর এক হাতে চা, অন্য হাতে খাবার। আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, এইটুকুন খাও। ধরা-গলায় বললেন, আর কি কখনও দেখা হবে? ফের রান্নাঘরে ঢুকে বেরিয়ে এলেন। এক হাতে লণ্ঠন, অন্য হাতে ছোট একটা মোড়া। মুখোমুখি বসলেন।

মধুবাবুর বাড়ির মধ্যাহ্ন-ভোজনের কথা মনে পড়ল। বিপদ কখনও একা আসে না। ভোজনের সঙ্গে করুণরস মিশ খায় না, রাসায়নিক মিশ্রণের (কেমিক্যাল কম্বিনেশন) পরিপন্থী। তবু উপায় ছিল না, খেতেই হ'ল। মনে পড়ল, স্বামীর অবধারিত মৃত্যুর পূর্বে বালিকাবধূকে জোর ক'রে ধ'রে শেষ মাছ-ভাত খাইয়ে দেওয়ার যৌবনে-দেখা এক অপরূপ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য।

তাঁর মুখে সকল কথা শুনে দুঃখিত হই। উকিল-পরিবারের এই কয় মাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—

ছেলেরা যে যার ফ্যামিলি কর্মস্থলে নিয়ে গেছে। এতে কিছু দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর আপত্তির কারণ বড় ছেলের ব্যবহার। আজ দু বছর চাকরি করছে, ভাল চাকরিই, বৃদ্ধ পিতাকে একটি পয়সাও সাহায্য করে নি। মেজো ছেলে কলেজের প্রফেসার, আয় কম, তবু সে মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাঠিয়ে দিত। ছোট ছেলে মেডিক্যালে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে—শ্বশুরের পয়সায়। সেদিন কোর্টে বক্তৃতা করতে করতে উকিলবাবু

অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পাঁচটি কন্যা পার করেছেন, তিনটি ছেলে মানুষ করেছেন, আর কি তিনি খাটতে পারেন? এখন বিশ্রাম চাই। ডাক্তারও তাই বলেছেন। ছেলেমেয়েদের বিষয়ে দায়িত্ব তাঁরা শেষ করেছেন, দেশে সামান্য কিছু জমি-জায়গা আছে, কোনও রকমে দিন চ'লে যাবে। তারপর ওদের ধর্ম্ম ওদের কাছে। ছোট বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেইখানেই থাকবে। তাদের অবস্থা ভাল।

এই সব কথা শুনতে শুনতে রাত্রি হয়ে গেল। একান্ত আত্মীয়ের মত সকল পারিবারিক ঘটনা খুঁটিনাটি খুলে বললেন। শেষে নিজেই বললেন, রাত হচ্ছে, এবার তুমি এস ভাই। আলো নিয়ে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

রাস্তায় নেমে নজরে পড়ল, আমার বাইরের ঘরের বারান্দায় ব'সে দুটো লোক সিগারেট কিংবা বিড়ি টানছে। বিড়িই হবে—আমাকে দেখে বিড়ি ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দুটি উচ্চহৃদয়কে অন্ধকারেও চিনতে পারি—গোবরা এবং জংলা। দাঁত বের ক'রে হাসতে থাকে, অন্ধকারেও তাদের দন্তবিকাশ দৃষ্টিগোচর হ'ল। জংলার মাথায় তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বিরক্ত হয়ে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকি।

ভিতরে সরি ব'সে ছিল। সরির মুখে শুনলাম—

গোবরা যেদিন ফিরে আসে, সেই দিনই তাদের সামাজিক বিচার শেষ হয়ে গেছে। শুনে আশ্বস্ত হই। আমার ভয় ছিল, এই অতি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিচারে আমাকেই যদি বিচারপতির আসন গ্রহণ করতে হয়! বিষয়টি অত্যন্ত জটিল—'কজ অফ অ্যাক্‌শন'—অপরাধের মূল কারণ অনুসন্ধান করতে হ'লে, প্রথমেই আবিষ্কার করতে হবে, হয় জংলার মনে কিছু দুরভিসন্ধি ছিল, কিংবা হয়তো জংলী ধরণের হ'লেও জংলার

কার্যকলাপ তার সরল মনের সহজ রসিকতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অর্থাৎ গোবরার লাঠিমারার সঙ্গত কারণ ছিল কি না!

সরিদের পাড়ায় সমাজপতিরা কিন্তু সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। অনুতপ্ত গোবরা স্বীকার করেছে, ওইটুকুন 'রঙ্গরস' তার 'লিজের' শালীর সঙ্গেও সে করতে পারত। তবে, প্রচুর 'তালরস সেবনের ফলে, দুর্ঘটনার সন্ধ্যায় সে কি দেখে কি ভেবে কি কাণ্ড করেছিল কিছুই তার মনে পড়ছে না। রক্ত দেখে 'চ্যাতনা' হতেই সে ছুটে পালিয়েছিল। প্রকাশ্য সভায় সরি বলেছিল, আমি অতসত বুঝি না বাপু! পথের ছেলেকে ডেকে আনাই বা ক্যানে, লাঠি মারাই বা ক্যানে, ঘাড়ে ধ'রে বিদায় ক'রে দিলেই পারতিস। খুনোখুনি হ'লে কি করতিস তু?

সমাজপতির রায়—যথা, জংলার সঙ্গে ব্যালফুলের বিবাহ। আমার ভূতপূর্বা একদিনের গৃহিণী 'ব্যালফুল'কে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। দ্বিতীয় শর্ত—বিবাহের ব্যয়ভার (মায় 'এক হাঁড়া' পচুইয়ের দাম—'হাঁড়া' হাঁড়ির বৃহত্তম সংস্করণ) উভয়ে পক্ষকে সমানভাগে বহন করতে হবে। এবং সস্ত্রীক ও সপুত্রকন্যা জংলাকে বিবাহের পর এক সপ্তাহের মধ্যে স্বগ্রামে ফিরে যেতে হবে।

বিচারে উভয় পক্ষেই সন্তুষ্ট, বলতে কি আমিও। কিন্তু আসল প্রমাণ এখনও বাকি। জংলাকে ব্রাহ্মণের পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে হবে যে তার মনে কিছু 'কু' ছিল না। এবং সে সদ্‌ব্রাহ্মণ আমিই।

প্রমাণের আগেই বিচারফল! আমি যতদূর জানি, কোনও হাইকোর্টেই এই প্রকারের মনস্তাত্ত্বিক বিচার এমন সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করতে পারতেন না। শুনেছি, ডক্টর রায় যে যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছেন, তার নাম 'মনোবিকলন'-যন্ত্র (ডক্টর রায় ইংরেজী পরিভাষা পছন্দ করেন না)। মানুষের মনের কথা ওই যন্ত্রটায় ফুটে উঠবে। আঃ,

যন্ত্রটা যদি সম্পূর্ণ হ'ত, আমার পা তুটোকে এই ব্যাপারে অনাবশ্যক তৃতীয় পক্ষে পরিণত হতে হ'ত না। অবশ্য আপাতত এ ছাড়া উপায় ছিল না। শাস্ত্রে আছে—

বিবাদেঽন্বিষ্যতে পত্রং পত্রাভাবে তু সাক্ষিণঃ
সাক্ষ্যভাবাৎ ততো দিব্যং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

মামলা-মকদ্দমায় প্রথমে দলিল খুঁজতে হবে, তার পরে সাক্ষী। সাক্ষীর অভাবে শপথ গ্রহণ। বলা বাহুল্য, আলোচ্য মামলায় দলিল কিছুই ছিল না। বাস্তব ঘটনার সাক্ষী অবশ্য ছিল, ভাল সাক্ষীই— উচ্চহৃদয় গোবরা এবং 'পাড়াকুঁতুলি' সরি নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্য সমগ্র পল্লীতে সুখ্যাত। কিন্তু হায়, মনস্তত্ত্বের সাক্ষী হবে কে ?

শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হ'ল। আপত্তি করলাম না, কারণ আমিও ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে চাই। এরই জন্য অপেক্ষা ক'রে উভয় পক্ষ এতক্ষণ ধ'রে আমার বাইরের বারান্দায় ব'সে ব'সে বিড়ি ফুঁকছিল।

পরদিন প্রাতর্ভ্রমণের পথে সরিদের পাড়ায় গিয়ে উক্ত পাড়ার 'মনীষী'দের ন্যায়বিচারের প্রশংসা করি। আপসোস ক'রে বলি, আমার ওপর কিন্তু অবিচার হ'ল। গিন্নীটি আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। প্রসঙ্গক্রমে বিড়ালদম্পতির মৎস্যভক্ষণের বৃত্তান্তটাও শুনিয়ে দিলাম। আমার তুঃখে কেউ তুঃখিত হ'ল না। সবাই হেসে উঠল। 'যার ব্যথা সেই জানে'। বালিকা-বধূর শ্বশুরবাড়ি-যাত্রা আনন্দ-বেদনার অপূর্ব সংমিশ্রণ !

জংলাকে বললাম, তোর কপাল ভাল। বুড়ো বরের জন্যে যে মাছ চুরি করে—

গিন্নী বললে, ধ্যেৎ !

ব্যালফুলের বানরীয় বুদ্ধি নারীত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কি ?

১৮

উকিল-পরিবার চ'লে গেছেন। তাঁদের বাড়িতে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ-পরিবার। গৃহকর্তা অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ, ল-কলেজে উকিলবাবুর সহপাঠী, পাঁচ মাস হ'ল এই শহরে এসেছেন। যে বাড়িটায় ছিলেন তাতে স্থানসংকুলান হচ্ছিল না। এ সব কথা দিদির (উকিল-গিন্নীর) মুখেই শুনেছিলাম।

এমন নীরব নিরুৎসাহ পরিবার আর কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, নেই তাদের বিবাদ-বিসম্বাদ আনন্দকলরব, বয়স্ক লোকদেরও এক টুকরো কথা কানে আসে না। অসহ্য রকমের শঙ্কিত বিষণ্ণ নিস্তব্ধতায় সর্বক্ষণ সমস্ত বাড়িটা ঘেরা। সেই ভাব তাদের চোখে মুখেও। কিন্তু কি তারা হারিয়ে এসেছে? ধনসম্পত্তি যাদের গেছে, তাদের আমি অনেক দেখেছি, তারা তো এমন নয়! 'গতস্য শোচনা নাস্তি' ভেবে তারা নূতন ক'রে ঘর বাঁধছে। পিছনপানে তারা ফিরেও চাইছে না, তাদের দৃষ্টি সম্মুখের দিকে। কিন্তু এদের যেন গুরুতর কোনও পিছটান আছে।

এদের নিয়ে আমি ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না! এদের দুঃখ ভাগাভাগির বস্তু নয়। এবং সেই দুঃখকে উপন্যাসের উপজীব্য করতে মনুষ্যত্বে না হোক—ভদ্রতায় বাধে।

উকিল-পরিবারের অতীত এবং বর্তমান সমস্যাটাকে বরং ভদ্রভাবে ফেনিয়ে ফেনিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে, যৌন-আবেদন-হীন হ'লেও, সাধারণ একখানা 'দেহতাত্ত্বিক' কিংবা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে পরিণত করা যায়। দেহতত্ত্ব যথা,—'কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ'। মনস্তত্ত্ব যথা,—হে উকিলবাবু! 'তত্ত্বং তদিদং চিন্তয় ভ্রাতঃ'! এই প্রকারের মনস্তত্ত্ব

নিয়ে উপন্যাস চলে কি? 'গোপন কথা' চাই! উকিল-দম্পতি (আগেই প্রমাণ করেছি যে তাঁরা দুজনেই উকিল) যে সব কথা গোপনে বলেছিলেন তা অতিসাধারণ—সর্বজনবিদিত গুপ্তকথা—ইংরেজিতে যাকে বলে 'ওপেন সিক্রেট'।

আমি যখন দেশ ছেড়ে চ'লে যাই, সে আজ কিছু-বেশি তিরিশ বছরের কথা। এর মধ্যে বেশভূষা, রীতিনীতি, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কতই না পরিবর্তন এসেছে! সাহিত্যেও তাই। এও দেখেছি, বধূদের জামা-শেমিজ পরা সেকালের গৃহিণীরা বিলাসিতা ব'লে মনে করতেন। স্বামীপ্রদত্ত ওই সব উপহার তারা লুকিয়ে রাত্রিতে ব্যবহার করত। আজ কিন্তু উল্টো! পরলে একালের গৃহিণীরা তাদের লজ্জাহীনা ব'লে অভিহিত করেন। মেয়েদের জুতো পরা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করত—সকাল-সন্ধ্যা এই ক্ষুদ্র শহরের পথে তাদের যখন দেখি, সে কথা আর বিশ্বাস করবার উপায় থাকে না। লেখাপড়া বর্ণপরিচয় পর্যন্ত—আজকের পাকা গিন্নীরা বিবাহযোগ্য মেয়েদের প্রথম পরিচয়েই জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ ক্লাসে পড়? মেয়েদের তো দূরের কথা, ছেলেদেরও গুরুজন-সমক্ষে গান গাওয়া অশিষ্টতা ব'লে গণ্য হ'ত। ছেলেদের সঙ্গীত প্রতিভা বিকাশের একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল যাত্রার দল—অধঃপাতেরও। আজ এইটুকু শহরে মেয়েদেরও গানের স্কুলের প্রয়োজন হয়েছে—অন্তুর ক্ষুদ্র সংসার সচ্ছন্দে চলে। রুচি এবং অক্ষমতার মিশ্রিত কারণে বাল্যবিবাহ লুপ্ত হতে চলেছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে, নীতি এবং দুর্নীতির বিচারে বঙ্কিম অতিকষ্টে আসামীর কাঠগড়া থেকে মুক্তি পেয়েছেন। রোহিণীকে খুন ক'রে এবং শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ক'রে চতুর বঙ্কিম আত্মরক্ষা

করেছিলেন। যে-সব সমালোচক বলেন যে, এইভাবে বঙ্কিম আর্টকেও হত্যা করেছেন, তাঁরা ভ্রান্ত না হ'লেও স্থূলদর্শী—দেশকালপাত্রভেদে এবং অভেদে চাতুর্যই একটা আর্ট!

'ঘরে-বাইরে' নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন আসামীর কাঠগড়ায়। কাব্য এবং সাহিত্যের, আর পাঁচটা দিক থেকে 'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট' দাখিল ক'রে রেহাই পেয়েছেন। দেশ ছাড়ার অব্যবহিত পরে খবর পাই, 'চরিত্রহীন'-লেখকের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে, কিন্তু ঘাড় শক্ত ব'লে ফাঁসি দিয়েও মারতে পারে নি। 'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী'। শরৎ-শিষ্য ছোট-বড় অনেককেই তারা 'কোর্ট মার্শাল' অর্থাৎ গুলি ক'রে মেরেছে, কিন্তু এই নীতি-বিদ্রোহী রক্তবীজের ঝাড় নির্মূল করতে পারে নি।

শুনেছি, ইংরেজের পুলিস লাঠি মেরে মেরে মহাত্মাজীর অসহযোগ-আন্দোলন ব্যাপকতর ক'রে তুলেছিল। সমালোচনার বন্যা স'রে যেতেই, তার পলিমাটিতে দুর্নীতির চাষ জোর পেয়ে গেল। আমার আপত্তি এইখানেই। সাহিত্যের প্রায় সবটুকু জমিতেই যদি এই গলা-কুটকুটে সিদুরে-পাতা কচুর চাষ চলে, এই রোগ-শোক-দুঃখ দৈন্য-ভরা পৃথিবীতে অন্ন-পথ্য জুটবে কেমন ক'রে?

দেশ-দেশান্তর ঘুরেছি, বহু পরিবারের আতিথ্য নিয়েছি, কিন্তু নরনারীঘটিত সমস্যা একটার বেশি আমার জানা নেই। এই শহরেও এক বৎসর বাস করছি, নিষ্কর্মা লোকের মেলামেশার সুযোগও প্রচুর, উক্ত সমস্যা শুধু একটি আমার নজরে পড়েছে। 'মন্-মনমে' অনেক কিছু থাকতে পারে, কিন্তু তা বাস্তব উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে না। বাস্তবকে অবলম্বন ক'রে যে মনস্তত্ত্ব, তাই হবে উপন্যাসের উৎকৃষ্ট উপকরণ।

জংলা-গোবরা-ঘটিত ব্যাপারে যে সুগভীর মনস্তত্ত্ব বা গোপন কথা

কিছু ছিল না, তা প্রমাণ হয়ে গেছে। জংলা আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছে। জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামিলির বাড়িখানা আজও আমার কাছে রহস্যাবৃত। অর্গান-বাজানো মেয়েটি, কে জানে, কি!

তারপর ডক্টর রায়ের ফ্যামিলি। উচ্চশিক্ষিত এবং আধুনিক। ফ্যামিলি মানে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী এবং আশপাশের দু-চারটে ডালপালা যা বাড়ির ওপর এসে পড়েছে। এদের জীবনে সমস্যা আছে আর সে সমস্যা নিতান্ত অবহেলার যোগ্য নয়। সহজে মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যায় না।

হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রী অতসী। বিদুষী এবং কবি। কদিনের বা আলাপ! বয়সের ব্যবধানও প্রচুর! কিন্তু সে আমার কাছে তার জীবনের কঠিন প্রশ্ন তুলতে চেয়েছিল, চেয়েছিল তার সমাধান, যার ভয়ে আমি ওদের কাছ থেকে দূরে স'রে পড়েছি। স্বামী-স্ত্রী হয়েও তাদের মধ্যে সদ্ভাবও নেই, বিবাদও নেই—স্ত্রীর জীবনে গোপন কথা আছে, এর চেয়ে সন্দেহজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে?

কিন্তু এ নিয়ে আমি কেন এত ভীত হয়ে পড়লাম? পাছে কোনও কলঙ্কিত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে, এই তো? কিন্তু তাতে আমার কি? আমার পবিত্র জীবনে পাপস্পর্শ করবে?

নিজের দিকে পিছন ফিরে চাই
প্যারিসের ক্ষুদ্র পরিবার—
একটি তরুণী, তার বিধবা মা, দুটি ছোট ছোট ভাই—
আমি তাদের অতিথি, পেয়িং গেস্ট—
মেয়েটিকে আমি ভালবেসেছিলাম—
এবং সেও বোধ হয়…
মাত্র পাঁচ মাসের অবস্থিতি—

ভাগ্যক্রমে তার মা অতিকষ্টে ব্যাপারটাকে সামলে নিয়েছিলেন। আমি শুনে শিউরে উঠেছিলাম, মেয়েটি অন্যপূর্বা। তার স্বামী যুদ্ধে যাবার আগে তার মার কাছে রেখে গেছে। মাসে মাসে খরচ পাঠায়।

আজ ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, কি অন্ধ আবেগে আমি অগ্রসর হয়েছিলাম, যাকে ভালবাসতে যাচ্ছি, সে বিবাহযোগ্যা কি না—সে সন্ধান নিতেও ফুরসুত পাই নি।

অথচ আজকের এই বয়সে নিষ্কলঙ্কতার ভান করা কত সহজ! মনে মনে লজ্জিত হলাম। অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ—

ডাকে চিঠিপত্র এল। চিঠিপত্র মানে একটা মাসিকপত্র, দুখানা সংবাদপত্র—একখানা বাংলা দৈনিক, অন্যখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক। কিন্তু তার সঙ্গে একখানা খাম। আমাকে খামে চিঠি লিখ্‌লে কে? তবে কি···তবে কি···বাংলা দৈনিকটায় এতদিন ধ'রে যে বিফল বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলাম, আজ এতদিন পরে তার জবাব পাওয়া গেল? দুরুদুরু বক্ষে কম্পিত হস্তে খামখানা ছিঁড়ে দেখি—প্রভাতরবি লিখছে:

দাদু, যন্ত্রের কয়েকটা সূক্ষ্ম অংশের পরীক্ষার জন্য কলকাতা এসেছি। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় চ'লে এলাম, আপনাকে ব'লে আসা হয় নি। অতসী এখনও সম্পূর্ণ সেরে উঠতে পারে নি, দয়া ক'রে ও-দিকটায় নজর রাখবেন। আমার ফিরতে কিছু দেরি হবে।

আপনার প্রভাতরবি

বুঝলাম, যে আশায় খামটা খুলেছিলাম, সে আমার সারা জীবনের দুরাশা মাত্র।

ডক্টর রায় তা হ'লে এখানে নেই। নিজের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা নিয়ে অতসী কি করছে কে জানে! হয়তো আমি তাকে কিছু

সাহায্য করতে পারতাম, হয়তো আমার সাহায্যে সে মনের অশান্তি দূর করতে পারত। অতসী বলেছিল, আমি তার উপকার করতে পারি···

আমার মনে এই আত্মপ্রবঞ্চনা কোথা হতে এল? তলিয়ে ভেবে দেখলাম, স্বার্থপরতা ভিন্ন কিছুই নয়। যে কাদা নিজে মেখেছি, পরের জন্য তা মাখতে যাব কেন?

আমার ভাবা উচিত ছিল, নিশ্চয় এ তার কোনও বেদনার ইতিহাস, একটা কিছু জীবন-মরণ-সঙ্কট হয়তো, যা থেকে উদ্ধার পেতে সে পিতৃস্থানীয় আমার আশ্রয় চেয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলায় অতসীর সঙ্গে দেখা করব ব'লে দৃঢ়সংকল্প হই। আজই।

যথারীতি অর্থাৎ যেমন-তেমন ক'রে দুপুরবেলাটা কাটল। ভাবনা হ'ল, অতসী আবার অসুখে পড়ে নি তো? সেও তো আমার সঙ্গে দেখা করতে পারত! অথচ ডক্টর রায় এখানে নেই। কিন্তু তা নয়। তা হ'লে তার অসুস্থতার খবর অনু পূর্ণিমা এরা কেউ আমার কাছে পৌঁছে দিত—নিশ্চয় আমার সাহায্য নিত। ব্যাপার কি?

খুব সম্ভব, অসুস্থ অবস্থার মানসিক দুর্বলতায় আমার কাছে তার মনের দুয়ার খুলতে গিয়ে, আধ-খোলা ক'রে সে লজ্জিত হয়ে পড়েছে। তাই হবে। এত কথা আমি আগে ভাবি নি।

যাই হোক, সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়ি।

সাদা ধবধবে প্রকাণ্ড বাড়িখানার উপর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

ডক্টর রায়ের উচ্চ উদার নির্মল হৃদয়ে সন্দেহের ছায়া ও কি?

ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, দুয়ারে দুয়ারে পর্দা ফেলা, পর্দার আশ-পাশ দিয়ে গোপন হৃদয়ের আবছায়া কথার মত ছিটেফোঁটা আলোর রেখা—

আমার পায়ে কেড্‌স্‌।

বাড়িখানা নিস্তব্ধ।

শঙ্কিত মনে ধীরে ধীরে ল্যাবরেটরি-ঘরের পর্দা তুলে ঢুকতেই—

যা দেখলাম তা আমার কল্পনাতীত!

যন্ত্রের টেবিলটার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অতসী আর বিভূতিবাবু। কিন্তু এমন একটা অবস্থায় যা স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন আর কারও পক্ষে সম্ভবও নয়, শোভনও নয়।

বিভূতিবাবুর হাত গিয়ে উঠল অতসীর কাঁধে, এবং—

এর বেশি আর নাই বা লিখলাম।

একটি মুহূর্তের ব্যাপার। নিঃশব্দে পর্দা ফেলে দিয়ে পিছু হঠলাম।

এই তবে তার আসল কথা! কষ্ট ক'রে খুলে বলতে হ'ল না, ঘটনাচক্রে আমার কাছে এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট। ধৃষ্টতা তো কম নয়! ওর ছেলেবেলাকার প্রাইভেট টিউটর···

পশ্চাতে অতসীর ক্রন্দনমিশ্রিত ক্রুদ্ধ চিৎকার কানে ভেসে এসে মিলিয়ে গেল···

চতুরিকার চাতুর্য বুঝতে দেরি হ'ল না। আমাকে চিনতে পারুক আর নাই পারুক, তৃতীয় ব্যক্তির আগমন-বার্তা ওদের অজ্ঞাত ছিল না। চমৎকার অভিনয়!

···শিক্ষার সঙ্গে রুচিরও কি কোনও সম্বন্ধ নেই? কোথায় প্রভাতরবি আর কোথায় বিভূতি!

দুঃখিত, ওর জন্যে আমি সত্যই দুঃখিত।

সকালবেলা চুপ ক'রে ব'সে আছি, বাড়িখানা বিক্রি ক'রে দিয়ে এখান থেকে পালাব কি না ভাবছি। এবার যেখানে যাব, অবশ্য এখনও তা স্থির করি নি, আর কোনও কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি না,—না, কিছুতেই না। মানুষকে যারা ভালবাসে, তাদের উচিত মানুষের কাছ থেকে বহু দূরে বাস করা।

দূর নিভৃত পল্লীতে গিয়ে বাসা বাঁধব। উকিল-দিদির গাঁয়ে? না, সেও হবে এক বিরক্তিকর নূতন বন্ধন। কাজ নেই। বন্য কিংবা পার্বত্য কোনও আদিমজাতির গ্রাম্য পরিবেশ···সেই ভাল। বেছে নিতে হবে, খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। সভ্যসমাজের সংস্পর্শে এসে যারা হিংস্রত্ব ভুলেছে, সারল্য ভোলে নি—চমৎকার! সরিকে সঙ্গে নিতে হবে, অবশ্য যদি আপত্তি না করে। আপত্তি? আমি খুব ভাল ক'রেই জানি, সে আপত্তি করবে না। নিরাশ্রয় জগতের পথে একলা সে আমাকে ছেড়ে দিতে চাইবে না, এ সুনিশ্চিত। তার তিনটি ছেলেমেয়ের মধ্যে তার দৃষ্টিতে আমিই সবচেয়ে বেশি অপোগণ্ড। ওদের সম্বন্ধে দেখেছি তার স্বভাব-স্নেহ, আমার বিষয়ে ওর চোখে দেখেছি সেই ব্যাকুল শঙ্কা, যা সমগ্র শিশুজগৎকে ঘিরে রেখেছে।

কোলের মেয়ে ব্যালফুলেরও বিয়ে হয়ে গেছে। (ওর প্রকৃত নাম ভাদুমণি, কারণ সে ভাদ্র মাসে হয়েছিল)। শুনলাম, সে সুখেই আছে। একেবারে পাকা গিন্নী, জংলার মাতৃহীন সন্তান দুটিকে শাসনও করে, যত্নও করে।

আর একটা পথ খোলা আছে। কিশোর-পূর্ণিমার বিয়ে দিয়ে, অনুকে কন্যারূপে গ্রহণ করলে উভয়ে উভয়ের আশ্রয়স্থল হতে পারি। ডক্টর

রায় আপত্তি করবেন না নিশ্চয়, অনুকেও খেটে খেতে হবেনা। বিয়েটা না হয় আমার খরচেই হ'ল। পুতুলের বিয়ে মনে আছে আপনাদের ?

এরা দুজন নির্ঝঞ্ঝাট, কোনও প্রকারের অশান্তির কারণ হবে না। বড় জোর সরি এসে মাথায় তেল দিতে লেখার কাগজে তেলের ছিটে লাগাবে। না হয় অনুর দুটো ধমক খাব। নগীর কথা উঠতেই পারে না, সংসারী না হয়েও সে ঘোর সংসারী।

এই সব আবোল-তাবোল ভাবছি, হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকে মধুসূদনবাবু বললেন, দাদা, একটু উপকার করতে হবে।

না, ও-সবে আর আমি নেই। তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ?

তিনি বললেন, আসছে মাসে তাঁর মেয়ের বিয়ে। সেই ব্যাপারে আমার একটু সাহায্যের দরকার। এই তো দু-দশ পা পরেই তাঁর বাড়ি, একটু কষ্ট ক'রে হেঁটে যাওয়া আর কি! তার বেশি বিশেষ কিছুই করতে হবে না।

মীরার বিয়ে। কিন্তু আমাকে কি করতে হবে, খুলে বললেন না। পাড়াপড়শী, সামান্য একটু উপকার, মেয়েটারও একটা গতি হবে। চটি পায়েই দাঁড়িয়ে উঠে বলি, চলুন।

দুজনে নীরবে পথ চলেছি, কতটুকুই বা পথ! বাড়ির কাছাকাছি এসে বললেন, একটা দলিলে সাক্ষী হতে হবে। সই ক'রে দেবেন, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

চমকে উঠলাম। এই আর এক অপ্রিয় সংস্রব। কন্যাদায়ে প'ড়ে সম্পত্তি বেচবেন। বিরক্ত হলাম, কিন্তু তখন এসে পড়েছি।

খাটের ওপর ব'সে আছেন মনোহরবাবু এবং অন্য এক ভদ্রলোক। দেখে মনে হয়, ইনিই মধ্যমকর্তা নরহরিবাবু। পরে জানলাম, আমার ধারণা সত্য।

আমার জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন মধুবাবু।

ঘরে আরও তিনজন লোক ছিল। দুজনকে প্রস্তাবিত দলিলের সাক্ষী ব'লে বোঝা গেল, দেওয়াল ঘেঁষে বেঞ্চির ওপর ব'সে ছিল তারা।

অপর একটা চেয়ারে ব'সে ছিল আমার অপরিচিত এক যুবক, বোধ হয় এই বাড়িরই কেউ। ব্যাকব্রাশ করা চুল, স্বচ্ছ কপাল, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, রিম্‌লেস চশমার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বলতর—উঁচু নাক, মুখখানি ভরাট না হ'লেও সুশ্রী মসৃণ, মুখে সৌজন্যের স্মিতহাস্য। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চেয়ার থেকে একটু উঠে নমস্কার জানালে।

দলিল লেখা হয়ে গেছে। বাকি শুধু টাকার আদান-প্রদান, সাক্ষীদের স্বাক্ষর। পরে রেজেস্টারি হবে। নরহরিবাবু এক হাজার টাকায় মধুবাবুর অংশটা কিনে নিচ্ছেন। মধুবাবু কোথায় যাবেন? সম্ভবত এখনও ভেবে ঠিক করেন নি। বিয়েটা তো চুকে যাক।

কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে যুবক বললে, আমার ইচ্ছে, কাকার এই অংশ আমি নিজেই কিনে রাখি আমার নিজের টাকায়। অবিশ্যি বাবা কিনলেও সেই একই কথা, কিন্তু আমার নিজস্ব নিরিবিলি খান-কতক ঘরের দরকার। মাঝে মাঝে বাড়ি আসি, আমি গোলমাল সইতে পারি না মোটেই।

এই কথা শুনে নরহরিবাবুর মুখখানা ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করতে গিয়ে আরও বেশি কালো হয়ে গেল। কথাটা আসলে একই নয়, যথেষ্ট তারতম্য ছিল। নরহরিবাবুর দুই ছেলে, এইটি জ্যেষ্ঠ। উত্তেজিত ভাবে বললেন, এখন তা বলবি বইকি। গায়ের রক্ত জল ক'রে মানুষ করলাম, দুপয়সা রোজগার করছিস, নিজের বুঝ বুঝে চলতে চাস, নয়? ভবিষ্যতে নরু যদি ভাগ বসায়, এই তো?

বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে ছেলেটি চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, নিজের বুঝ কে না বোঝে বল? গোড়া থেকে বুঝে স্থঝে না চললে শেষের দিকে ঠকতে হয়। তার দৃষ্টান্ত কাকা নিজেই।

পিতা বললেন, বটে! পেটে পেটে তোর এত সব ছিল? বউমা পরামর্শ দিয়েছেন বুঝি?···আমি দেড় হাজার টাকা দেব।

পিতা-পুত্রে প্রকাশ্য বিবাদ। এ আমার বিধিলিপি—একটা কিছুতে জড়িত হয়ে পড়া।

তাক বুঝে জ্যেষ্ঠ মনোহরবাবু বললেন, কন্যাদায়ে প'ড়ে মধু তার বসতবাটি বিক্রি করছে। আমার কাছে ন্যায্য বিচার, যে বেশি দাম দেবে, সেই পাবে। তার কাজ টাকা নিয়ে।

ছেলেটির হাত ধ'রে মধুসূদনবাবু বললেন, কথাটা ভাল হচ্ছে না হরু। ছি বাবা, এই নিয়ে কি বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে? তা ছাড়া দলিল যখন মেজদার নামেই লেখা হয়ে গেছে—

এমন সময় সেই মজলিসে (দলিল-সম্পাদন-সভাকে আইনের ভাষায় 'মজলিস' বলে) প্রবেশ করলেন এক অপরূপ চতুর্থ সাক্ষী—কেউ তাকে ডাকে নি। অক্ষম পদক্ষেপে হরুর কাছে গিয়ে বললে, বা-ব-বাঃ! বিশ্বরূপ।

তাকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে হরেন্দ্র জবাব দিলে, বাড়ি তুমি মোটেই বেচবে না কাকা। বাড়ি আমি কিছুতেই বেচতে দেব না।

মধুবাবু কেঁদে ফেললেন। তা হ'লে উপায়? সামনের মাসে মীরার বিয়ে। এক ছাদের তলায় তিন অংশ, মাঝেরটা তাঁর। এ বাড়ি বাইরের লোক কিনতে চাইবে না, আর কিনলেই কি দেওয়া উচিত?

আমাকে লক্ষ্য ক'রে নরহরিবাবু প্রশ্ন করলেন, দেখলেন মশাই, উপযুক্ত ছেলের ব্যবহারটা? কলি পূর্ণ হয়েছে, কি বলেন?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না, কারণ কলির কালপরিমাণ আমার জানা ছিল না। উত্তর দিলে তাঁর উপযুক্ত পুত্র। বললে, আমার দ্বারা কলি পূর্ণ হ'ল কি না জানি না, তবে তা আরম্ভ হয়েছে অনেক আগে। কলির ভাগ্যে যাই ঘটুক, আমি ভুলতে পারি না, সারাদিন ইস্কুলে ব'কে সকাল-সন্ধ্যে আমার পিছনেই লেগে থাকতেন তিনি, যাতে আমি স্কলারশিপ পাই। পরীক্ষার সময়, শীতের শেষরাত্রে ঘুম থেকে তুলতেন। বৈকালে সামান্য অবসর, আমাকেই সঙ্গে ক'রে বেড়াতে যেতেন, মুখে মুখে উজাড় করতেন দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার।··· নিজের নামে সম্পত্তি কিনছি, এতে তোমার আপত্তি কি থাকতে পারে? তোমার আপত্তি এইখানে যে, নরু তার অর্ধেক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নরুকে আমি ফাঁকি দেব—এ ধারণা তোমার কেমন ক'রে হ'ল?···কেন, কাকাকে এই টাকাটা তো তুমি এমনি দিয়ে দিতে পারতে? তোমার অভাব কিসের? তোমারও তো সে মায়ের পেটের ভাই! (আমার দিকে চেয়ে) জ্যাঠা-খুড়োকে পর ভাবতে শিখিয়ে এঁরা নিজেদেরই আসন আলগা করেন, সেই সঙ্গে শিথিল করেছেন বাঙালীর পারিবারিক জীবন।

আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন কোনও উচ্চশ্রেণীর রঙ্গমঞ্চের সামনে ব'সে আছি। তার বক্তৃতাস্রোতে বাধা দিয়ে, 'যা ভাল বোঝ কর'—এই কথা ব'লে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত নরহরিবাবু উঠে চ'লে গেলেন।

ছেলেটি তার পকেট থেকে একতাড়া নোট বের ক'রে বললে, এই নাও কাকা, আপাতত এক হাজার টাকা। আপনারা সাক্ষী, বিনা শর্তে টাকাটা আমি মীরাকে দিলাম।

বোঝা গেল, গোড়া থেকেই সে মহত্ত্বের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসেছিল। বললে, কাল রাত্রে কলকাতা থেকে এসে ব্যাপারটা সে জানতে পারে তার স্ত্রীর কাছে। সকালে উঠে দেখে, দলিল এবং সবই প্রস্তুত।

সবেগে পুনঃপ্রবেশ ক'রে নরহরিবাবু জানালেন, দলিল প্রস্তুত। আপনারা দেখছেন, ছেলেটাকে ভুলিয়ে মধু এক হাজার টাকা আদায় ক'রে নিচ্ছে। এ কথা আদালতে প্রমাণ হবে।

হরেন্দ্র বললে, দলিল চুলোয় যাক। টাকাও থাক্ আমার পকেটে। মীরার বিয়ের ভার আমার। আমি কাকীমার কাছে যাচ্ছি। কালই দেখা করব বরপক্ষের সঙ্গে। হ'ল তো?

সসংকোচে মধুবাবু বললেন, কাজটা কি ভাল হবে বাবা? এই নিয়ে একটা গৃহবিবাদ সৃষ্টি করা—

গৃহবিবাদ তো হয়েই আছে কাকা। এই বয়সে বাড়ি ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে? কাকীমার শরীর দেখেছ? না, সে দিকে তোমার দৃষ্টি আছে?…আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই। হয় আমি এ বাড়ির ছাদ ভাঙব, না হয় ভাঙব পার্টিশনের দেওয়াল।

তার চূড়ান্ত বিচার জানিয়ে দিয়ে বোধ হয় সে তার কাকীমার কাছে চ'লে গেল। আমি আশ্চর্য হলাম, উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ সত্ত্বেও আগাগোড়া তার মুখের স্মিতহাস্য একটুও বিকৃত হয় নি। বিমূঢ় মধুবাবু তার পিছু পিছু বাড়ির ভিতর ঢুকলেন।

মনোহরবাবুর সঙ্গে নরহরিবাবুর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হ'ল। আমি তার অর্থ বুঝলাম না। সাক্ষী দুজন নির্লিপ্ত ভাবে বেরিয়ে গেল।

ভাবপ্রবণ বাঙালী যুবক! কিন্তু এটা তার মহত্ত্ব নয়, খাঁটি অভিনয়ও নয়, মহত্ত্বের প্রলোভন মাত্র। কর্তব্যবোধও ছিল কতকটা। কিন্তু

সে যদি এই সাহায্য গোপনে করত, এত সব হাঙ্গামার সৃষ্টি হ'ত না। এ যেন টেনে-বুনে তৈরি করা ভাবুকতার নাটকী দৃশ্য একটা।

ডক্টর রায়ের হ্যাণ্ডনোটঘটিত মহত্ত্বের কথা মনে পড়ল। উক্ত হ্যাণ্ডনোটের মহান্ অঙ্কটা দান করবার জন্য উকিলবাবুর চেয়ে যোগ্যতর পাত্র বাংলা দেশের পথে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। যোগ্যতম! দুঃখের বিষয় ব্যাকরণে ওর চেয়ে যোগ্যতর প্রয়োগবিধি নেই। মহত্ত্বের প্রলোভন! মহত্ত্বের চেয়ে কর্তব্যবোধকে আমি অনেক বেশি শ্রদ্ধা করি। মনস্তত্ত্বের আর একটা দিক—হয়তো তার স্বার্থপর বৃদ্ধ পিতাকে সর্বজনসমক্ষে সমুচিত শিক্ষাদানই এই অত্যুৎসাহী যুবকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তার মনের কথা তার বক্ষস্থিত বিশ্বরূপই বলতে পারেন।

উপন্যাসের উপকরণ হিসাবে আমার এইটুকু লাভ হ'ল যে, আমি জানতে পারি, এই মহাত্মাই বিশ্বরূপের মা-যশোদার পতিদেবতা। 'মা যশোদা, বাবা নন্দ'।

২০

মহত্ত্বের প্রলোভন জগতের বহু মহৎ কার্যের কারণ হ'লেও, তার একটা অনিষ্টের দিকও আছে। স্বার্থপর পিতা ও বিদ্রোহী পুত্রের অপর এক ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ফলভোগ আজীবন আমাকেই করতে হয়েছে।

আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হ'ল জীবনেতিহাসের কয়েকটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল পৃষ্ঠা। যৌবনের আগমনীতে ভরপুর প্রাণ—তার কাছে সবই সুন্দর, সবই মহান্। কিন্তু তার পরবর্তী ইতিহাস মেঘাচ্ছন্ন।

বন্ধুর শুভবিবাহে বরযাত্রী গিয়েছি। কন্যার পিতা বড়লোক,

উৎসবমুখরিত প্রকাণ্ড বাড়ি—আদর-আপ্যায়নের অন্ত ছিল না। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি ছিল তাঁদের বরের বন্ধুদের উপর।

সন্ধ্যার পরেই লগ্ন ছিল একটা। বহুসংখ্যক বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী সময়োচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে আলোকোজ্জ্বল বিবাহ-সভা অলঙ্কৃত করছেন। যথাকালে সালঙ্কারা কন্যা সভাস্থ হ'ল। একেই বলে সালঙ্কারা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ কোনও অলঙ্কারই বাদ ছিল না। কিন্তু মেয়েটির গায়ের রঙ অত্যন্ত কালো, বাস্তবিক আপত্তিজনকভাবে কালো।

পিতার নির্বাচনে অসন্তুষ্ট হয়ে পাত্র গেল বিগড়িয়ে। সবার মুখে এক কথা—ছি ছি, এই ছেলের ওই বউ! ভদ্রলোকের কি চোখ ছিল না? আমরাও বিরক্ত হয়েছিলাম, তবু ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতেই চেষ্টা করেছিলাম।

তিনি নিজে অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু কিছু ফল হ'ল না। বন্ধুবর—অর্থাৎ আমাদের বন্ধু এবং সেই বিবাহের বর—আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বোঝা গেল, তার পিতার চোখ ছিল এবং সেই চোখের দৃষ্টিও ছিল সবিশেষ তীক্ষ্ণ, কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল অন্য দিকে। পুত্রের পছন্দ-অপছন্দের দিকটা তিনি ভেবে দেখাও দরকার বোধ করেন নি। তাঁর ছেলে যে এতবড় আকাট-মূর্খ—এ ছিল তাঁর কল্পনাতীত। রূপ-যৌবন দু দিনের, কিন্তু সোনারূপা যত্ন ক'রে রাখতে পারলে চিরকালের।

ভদ্রলোক রেগে বললেন, আমাকে তুমি দশের সামনে অপদস্থ করলে, তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করব। কথাটা অসার আস্ফালনের মত শোনাল। আমাদের অজ্ঞাত ছিল না, উপার্জনক্ষম পুত্রকে পরিত্যাগ করলে তাঁর নিজের দারিদ্র্য ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ও-দিকে কন্যাপক্ষে হুলুস্থূল প'ড়ে গেল। কেউ বললে, মাথা ফাটিয়ে দাও। কেউ বললে, কেস করব—হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়ব। কেউ বললে, সহজে ছাড়ছি না। কনের বাপ-ভাইরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, মেয়েমহলে কান্নাকাটি।

যারা মাথা ফাটিয়ে দিতে চেয়েছিল, গণনায় তাদেরই মাথা ক'মে আসতে লাগল। যারা কেস করবে বলেছিল, তারা যেন আদালত খোলার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে রইল। যারা কিছুতেই ছাড়বে না, ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করল। হার্ট-দুর্বল মেয়ের মায়ের ফিট হওয়ায় মেয়েদের ক্রন্দনধ্বনি হট্টগোলে পরিণত হ'ল। কন্যাকর্তা বুক চাপড়াতে লাগলেন।

কিন্তু এ সবে আমি তত বেশি বিচলিত হই নি। আমার কবি-হৃদয়কে বিচলিত করেছিল আসনে উপবিষ্টা কনেটি, যে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছিল। এই অতি নীচ অপমানকর অবস্থা বোঝবার বয়স তার হয়েছিল এবং এই বিবাহপূর্ব বয়োবৃদ্ধির কারণ ছিল তার গায়ের রঙ।

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লাম। কন্যাকর্তার কাছে গিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলাম যে, যদি কোন বাধা না থাকে, আমি তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছি। আমার বংশ এবং গোত্র-পরিচয় তাঁর অবিদিত ছিল না। তা ছাড়া, তাঁকে আমার পিতৃবন্ধুও বলা চলে।

ভদ্রলোক হাতে স্বর্গ পেলেন। আশ্বস্ত হয়ে বললেন, বেঁচে থাক বাবা, তুমি আমার জাতকুল রক্ষা করলে। আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

এই কথা রাষ্ট্র হতেই বরকর্তা, বর এবং তাঁদের নিকট আত্মীয়স্বজন অতি সত্বর গা-ঢাকা দিলে। ভূতপূর্ব ও বর্তমান বরের ক্ষুধার্ত বন্ধুবর্গ

মহত্ত্ব ও লুচির প্রলোভনে ফিরে এল। দ্বিতীয় লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। মহত্ত্বের পুরস্কারস্বরূপ বন্ধুবর্গ আমাকে কাঁধে ক'রে নাচতে লাগল। এমন কি খবরের কাগজে আমার নাম বেরিয়ে গেল। হেডিং দিলে—যুবক জমিদারের অতুলনীয় মহত্ত্ব।

এই ভাবে আমার দাম্পত্যজীবনের সূত্রপাত। এই অস্বাভাবিক মিলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—পাপের মত মহত্ত্বেরও যে অনুতাপ থাকতে পারে, সে কথা আমি ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারি। এক দিকে করুণা, অন্য দিকে কৃতজ্ঞতা—এই নিয়ে, আর যাই হোক, প্রথম যৌবনের পতিপত্নীপ্রেম গ'ড়ে উঠতে পারে না। আবেগহীন উচ্ছ্বাসহীন ভালবাসায় যৌবনের ক্ষুধা মেটে কি?

এ সত্য গোপন ক'রে লাভ নেই যে, মহত্ত্বের মাদকতা যে পরিমাণে কাটতে লাগল, দিনের পর দিন ঠিক ততটাই নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব'লে বিবেচনা করি। আমার প্রাণের প্রবল রূপ-পিপাসা নিদারুণ নৈরাশ্যের রূপ পরিগ্রহ ক'রে অন্তরময় হাহাকার ক'রে ওঠে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও, নিজের মনের সঙ্গে প্রাণপণ যুঝেও অমলাকে আমি ভালবাসতে পারি নি।

তবু তার দেহমনের দিকে আমার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সজাগ। আমি যা দিতে পেরেছিলাম, প্রচুর ক'রেই দিয়েছিলাম; কিন্তু যেখানে আমি শক্তিহীন, সেখানে আমি করব কি? বরং এই দিকটার শূন্যতা পূর্ণ করতে বাইরের দিকটা প্রয়োজনের বেশি হয়ে ছাপিয়ে উঠছিল যতই, ভিতরে ভিতরে ততই আমি হাঁপিয়ে উঠছিলাম। এটা নিছক দয়া, তার প্রতি আমার এই স্নেহব্যবহারে অভিনয়ের লেশমাত্র ছিল না।

ধীরা ও সুধীরের সঙ্গে অনেকটা মেলে। চা ও গরম সিঙাড়া কি জুড়িয়ে গেছে?

কিন্তু তার বিষয়ে আমার মনের গোপন কথা তার চোখে একটু-

খানিও ধরা পড়েছিল ব'লে মনে হয় না। আমাকে পেয়ে তার সন্তোষ ও আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। আর পাঁচজনের সঙ্গে তার মেলামেশা খুব কমই ছিল, যেটুকু ছিল, তাদের সম্বন্ধে তার চক্ষুকর্ণ মোটেই সজাগ ছিল না। তার মন ছিল অহোরাত্র আমারই পূজায় নিমগ্ন। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প থেকে তার মনে ধারণা জন্মেছিল যে, স্বামীরূপী পুরুষরা সব দেবতাবিশেষ। স্বচক্ষে দেখলেও তাই, অতএব সংশয়ের অবকাশ কোথায়? এর চেয়ে নিশ্চিন্ত জীব আর কি হতে পারে? চিত্ত-বিলাসের স্বপ্নময় দেশ তার কাছে চিরজীবনই অনাবিষ্কৃত র'য়ে গেল।

প্রেমের চেয়ে পূজা অনেক বড়। প্রেম টলায় মানুষকে, পশুকেও হয়তো মানুষ করে; কিন্তু পূজা গলায় প্রস্তর-দেবতার মনকে। একদিন সন্ধ্যার পর ঘরে ঢুকে দেখি, অমলা আমার ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুগ্ধ দৃষ্টি ছবিটার দিকে একান্ত নিবদ্ধ। আমাকে তো সে অনবরতই দেখছে, ছবিতে নূতন ক'রে কি দেখছে ও? খুব সম্ভব, এমন একান্তে ও পরিপূর্ণভাবে দেখবার সুযোগ পায় নি। লজ্জা করে যে!...আমাকে ঢুকতে দেখে সলজ্জ হাসি হেসে স'রে দাঁড়ায়।

গোলাপও হাসে, অপরাজিতাও হাসে। গোলাপের খিল-খিল নির্লজ্জ রঙিন হাসি মূর্খের কাছেও ধরা পড়ে, কিন্তু সবুজের পাশে নীলরঙের ওই ছায়াশীতল শান্ত নীরব সলাজ হাসিটুকুর মূল্য ও মাধুর্য বুঝতে দার্শনিক দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। কবি ও দার্শনিক হবার স্পর্ধা রাখি, কিন্তু আমি কি মূর্খ! মনুষ্যচরিত্র দুর্জ্ঞেয়, রূপও কি তাই? রঙ? রঙই কি সব? ওই হাসি আর কোনও রঙে খাপ খেত না।

এই প্রথম আমি রূপতৃষ্ণার পূর্ণ আবেগে তার মুখচুম্বন করি।...

গভীর রাত্রে ও যখন ঘুমিয়ে পড়ে, আলো জেলে ব'সে ব'সে

নারীর রূপ-বিষয়ে সুদীর্ঘ একটা কবিতা লিখি। লিখতে লিখতে বার বার ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়েছিলাম। কবিতাটি হারিয়ে গেছে, মনেও নেই কিছু, ভাবটা শুধু মনের সঙ্গে গাঁথা আছে—

অসুন্দর নারীর রূপ একটিও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি
অনর্থক রূপ-মৃগতৃষ্ণিকার পিছন পিছন ঘুরে মরেছি—
সৌন্দর্য-বোধোদয়ের প্রথমপাঠেরও অর্থ জানি না।
মা-যশোদা ও যীশু-মাতার নতচক্ষের করুণ কোমল মায়া
ক'জন চিত্রকর ফুটিয়ে তুলেছে ?
রন্ধন-প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত ভগিনীর আনন্দোজ্জ্বল মুখচ্ছবির আভা
কোন্ যন্ত্রের কোন্ ফোটোতে ধরা পড়বে ?

কোন্ কবিতায় ব্যক্ত করব অমলার সেই হাসিটুকু ?···কিন্তু এ ক্ষণোচ্ছ্বাসমাত্র। সকল খণ্ড কবিতাই ক্ষণোচ্ছ্বাসের ফল।

বিবাহের পর দুই বৎসর কেটে গেছে। অবশেষে সকল অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায় দ্বিতীয় একটি সজীব কবিতা। হায় সেটিও হারিয়ে গেছে।

মেয়েটার রঙ হয়েছিল তার মায়ের মতই কালো। কিন্তু নাক মুখ চোখ দেখে মনে হ'ত, যেন পাকা কারিগরের তৈরি একটা কাঁচা মাটির পুতুল, এখনও রঙ লাগানো হয় নি। আর তার চোখের সেই অসহায় চাহনি ? আমার মন স্নেহরসে পূর্ণ হয়ে গেল, কোথাও কিছু ফাঁক রইল না।

বাড়িতে রূপলাল নামে আমার এক পুরনো চাকর ছিল। পৈতৃক 'পুরাতন ভৃত্য'। বয়সে প্রৌঢ় হ'লেও তার দেহে ছিল শক্তি, আর মনে ছিল ফুর্তি। তার বেশভূষা ও চালচলন দেখে কেউ তাকে ভৃত্য ব'লে মনে করতে পারত না। কোন্ খেয়ালে সে আজীবন অবিবাহিত রইল তা সেই জানে। সম্ভবত সঙ্গীত-সাধনাই এর মূল

কারণ ছিল। শুনেছিলাম, তার বাল্যকালে তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে বাবা তাকে সংগ্রহ করেছিলেন। আমার জ্ঞানে তাকে দু-তিনবারের বেশি দেশে যেতে দেখি নি।

রূপলাল বললে, খোকাবাবু, খুকীকে আমি বিয়ে করব, তোমার মত কি বল? বউমার মত আছে।

কেন, এতদিন পরে আবার এ শখ হ'ল কেন?

হ্যাঁ, হয়েছে। খুব বেশি রকম ঝোঁক।

করলেও তাই। সেই যে খুকী তার কাঁধে চড়ল, সেখান থেকে তাকে আর নামতে দেখি নি। এই বিবাহের ফলে তার শৌখিনতা কিন্তু একেবারেই খ'সে গেল। কেমন ক'রে থাকবে? ঘণ্টায় ঘণ্টায় খুকী তার কাপড় ময়লা ক'রে ফেলছে। সব কিছু বাবুগিরির মূলে তো সেই মাসান্তে পাঁচটি টাকা? খুকীর জামা-কাপড়-খেলনার কোনও অভাবই ছিল না। কিন্তু অনেক সময় তার হাতে অদ্ভুত নূতন খেলনা, গায়ে অসভ্য ছিটের জামা আমার নজরে পড়ত। বাধা দিলে শুনত না, দামও নিত না। এক কথায় মেয়েটা তার সর্বস্ব হয়ে উঠল।

প্রতি সন্ধ্যায় রূপলালের ঘরখানিতে যে গানের আসর বসত, তাও গেল বন্ধ হয়ে। স্তন্যদান ব্যতীত খুকীর প্রতি অমলার কোনও কর্তব্য ছিল না। রূপলালের মতে, আমরা ছেলেমানুষ, এ সবের মর্ম কি জানি! দেখা গেল, ও-রসে-বঞ্চিত রূপলাল কিন্তু যে-কোনও বর্ষীয়সী গৃহিণীকেও হার মানিয়ে দিতে পারে।

এখন মনে হয়, এ ব্যবস্থা ঊর্ধ্ব হতে এবং পূর্ব থেকে স্থির হয়ে ছিল। ঊর্ধ্বলোকের কর্তৃপক্ষের জানা ছিল, ফল প্রসব ক'রে বনফুল ঝ'রে পড়বে। খুকীর বয়স যখন প্রায় এক বৎসর, টাইফয়েডে ভুগে

অমলার মৃত্যু হ'ল। যমে-মানুষে দীর্ঘকাল টানাটানির পর মানুষের ঘটল পরাজয়। রূপলালের সেবাযত্ন চিত্রগুপ্তের খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। হয় সে পূর্বজন্মে অমলার কাছে ঋণী ছিল, না-হয় অমলাই তার কাছে পরজন্মের জন্য ঋণী র'য়ে গেল। পাটিগণিতের যোগ-বিয়োগ মানি ব'লেই জন্মান্তর মানতে বাধ্য, নইলে দেনা-পাওনার জের মেটে না।

অমলার মৃত্যুর পর খুকীকে রূপলালের হাতে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ ক'রে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই। একদিন পশ্চিম থেকে ফিরে এসে বললাম, রূপলাল, আমি দূর বিদেশে যাব, কাজ আছে। এত দূর যে, ফিরতে অনেক দেরি হবে, দু-তিন বছরও হতে পারে। মানুষের জীবনের ভরসা কি! খুকীর ভার তোমার ওপর রইল, আর সেই জন্যে একটা পাকা বন্দোবস্ত ক'রে যেতে চাই।

রূপলাল হাতে-পায়ে ধরলে, খুব খানিকটা কাঁদলে; কিন্তু আমার সংকল্পের নড়চড় হ'ল না। দেশের সমস্ত সম্পত্তি, কলিকাতার দুটো বাড়ি, নগদ দশ হাজার টাকা খুকীর নামে লিখে দিয়ে রূপলালকে তার অভিভাবক নিযুক্ত করলাম। দুখানা বাড়ির মাসিক আয় অন্তত দু শো টাকা হবে, এতেই তাদের স্বচ্ছন্দে চ'লে যাবে।

দেশের সম্পত্তির আয়ও বড় কম ছিল না। তবে, বাবার মৃত্যুর পর থেকে বিশেষ কিছু পাওয়া যেত না, অধিকাংশই কর্মচারীরা লুটেপুটে নিত। বাড়িতে শুধু বৃদ্ধ পিসীমা ছিলেন, তিনি ভালমন্দ কিছুই বুঝতেন না। বন্দোবস্ত রইল, এই সমস্ত আয় থেকে রূপলাল খাওয়া-পরা ছাড়া পারিশ্রমিক স্বরূপ মাসিক দশ টাকা হিসাবে পাবে। খুকীর কোনও প্রয়োজনে কিংবা তাকে নিয়ে কোনও দায়ে ঠেকলে, রূপলাল এই সব সম্পত্তি, কি তার যে কোনও অংশ বিক্রি করতে পারবে।

পিসীমা ক্রমেই অসহায় হয়ে পড়ছিলেন। সব দিক বিবেচনা ক'রে রূপলাল ও খুকীকে দেশের বাড়িতে দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসি। পিসীমাও কাঁদলেন। স্টেশনে গাড়ি ছাড়লে, খুকীকে কোলে ক'রে রূপলাল চোখ মুছতে মুছতে গ্রামে ফিরে গেল। ট্রেন ছাড়বার আগে খুকীকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়েছিলাম, সে শুধু হেসেছিল। সেই হাসি, মনের পাতায় আজও তার সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাই।

নির্দিষ্ট দিনে, শুভ কি অশুভ জানি না, কলকাতা থেকে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ি। প্ররোচনা দিয়েছিলেন আমার এক মধ্যপ্রদেশবাসী বন্ধু, নাম—হাসান শহিদ। তাঁর বুদ্ধিবলে দেশ-বিদেশে ব্যবসায় ক'রে আমরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করি। তিনিই মাঝে মাঝে পণ্য-সংগ্রহ করতে দেশে আসতেন। অর্থোপার্জন ও ভবঘুরেগিরির নেশায় আমাকে পেয়ে বসেছিল, ভারতবর্ষে আসতে মন সরত না।

প্রথম তিন বৎসর রূপলাল ও কর্মচারীদের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান অক্ষুন্ন ছিল। খুকীর সংবাদ নিয়মিত ও বিস্তারিত পাওয়া যেত। একবার রূপলাল লিখলে, পিসীমা মারা গেছেন, তার নিজেরও বয়স বাড়ছে, অতএব পত্রপাঠ যেন দেশে ফিরে যাই। এইবার আমার পক্ষে দেশে ফিরে যাওয়া অনিবার্য হয়ে উঠল। তবে, লণ্ডনে একটা জরুরি কাজ শুরু করেছি, পত্রপাঠ যাওয়া অসম্ভব। লিখলাম, এক বৎসরের মধ্যে ফিরে যাচ্ছি, সাত-আট মাসেও হতে পারে।

কিন্তু ছয় মাস অতীত হতে না হতেই অঘটন ঘটল। হঠাৎ দেশ থেকে চিঠিপত্র আসা বন্ধ হ'ল। চিঠির পর চিঠি লিখি, টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠাই, জবাব নেই। আরও তিন মাস পরে জনৈক কর্মচারী লিখলে, দেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। প্রাণভয়ে প্রায় সকলেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। খুকীকে নিয়ে রূপলাল যে কোথায়

গেছে কেউ জানে না। পরিশেষে উক্ত কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী জানিয়েছেন যে, তারা ফিরে এলে টেলিগ্রাম করবেন।

আমার বত্রিশ নাড়ী মোচড় দিয়ে উঠল। কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে, আবোল-তাবোল নিজের ভাগ বুঝে নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসি। স্বগ্রামে এসে জানতে পারি, তারা ফিরে আসে নি। সারা বাংলা দেশ, পরিশেষে সমগ্র ভারত তোলপাড় ক'রেও তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। তার নিজের দেশের সঙ্গে রূপলালের সম্বন্ধ ছিল খুব কম, সে কথা আগেই বলেছি। তার দেশের ঠিকানা কানে শুনলেও, মনে ক'রে রাখি নি। কিছুতেই স্মরণ হ'ল না।

রূপলাল বেঁচে থাকলে, নিশ্চয় তারা আমার দেশে ফিরে আসত। মেয়েটা যদি বেঁচেই থাকে, দেখাই যদি পাই, কেমন ক'রে চিনব তাকে? একমাত্র ভরসা, তার কাছে আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞান থেকে যেতে পারে।

ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে, ফের বিদেশে গিয়ে হাসান সাহেবের সঙ্গে মিলিত হই। একটা কিছু তো করতে হবে! বন্ধনহীনেরই উপযুক্ত জীবন, লণ্ডন থেকে প্যারিস, সেখান থেকে বার্লিন, বার্লিন থেকে টোকিও এবং কারণে-অকারণে দেশ-দেশান্তর। এইভাবে আরও পঁচিশ বৎসর কাটিয়ে, একান্ত ক্লান্ত হয়ে এখানে এসে বাসা বেঁধেছি।

অতিক্ষীণ শেষ দুর্বল নির্ভর—খবরের কাগজে আমার দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলো। যদি সে বেঁচে থাকে…যদি সে লেখাপড়া শিখে থাকে… যদি তার কাছে আমার কিছু পরিচয়-চিহ্ন ঘটনাক্রমে আবিষ্কৃত হয়…। কিন্তু কোথায় সে? বেঁচে আছে কি?

২১

দুপুরবেলায় শয্যা গ্রহণ ক'রে এই সব অতীতের কথা ভাবছি। বাইরের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। দুপুরে এই ঘরটাতেই যা হোক কিছু কিংবা গড়িমসি করি; জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজা ঠেলে শশব্যস্তে কিশোর এসে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার কাছে পিস্তল আছে স্যার ?

আমি বললাম, আছে। কিন্তু তুমি ব'স। পিস্তল নিয়ে কি করবে ?

সে বললে, দরকার আছে। বসল এবং শান্তভাবেই ব'লে চলল, জানি, আপনাকে খুলে না বললে আপনি সাহায্য করবেন না।... বিভূতিবাবুটা অত্যন্ত পাজী।

আমি তাকে জানালাম যে, এসব সংস্রবে আমি থাকতে চাই না।

আপনি না শুনেই বলছেন স্যার ?

তুমি যা বলবে, আমি তার কতক জানি। যা জানি, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর আমি জানতে চাই না।

আপনাকে জানতেই হবে। আপনি কেন, এই বিষয়ে আমি যে-কোনও লোকের সাহায্য দাবি করতে পারি। আগে সবটা শুনুন, তারপর বিচার করবেন।

তা হ'লে ব'লে যাও। তুমি যদি শুনতে বাধ্য কর—

একজন ভদ্রমহিলার সম্মান রক্ষার জন্যে আমাদের সব কিছু করা উচিত। নয় কি ?

সন্দেহ কি ?

ডক্টর রায় এখানে নেই। সেই সুযোগে বিভূতিবাবু মিসেস রায়কে

অপমান করেছেন···মানে, ভদ্রমহিলার···মানে, নারীর পক্ষে অপমানকর ব্যবহার···মানে···

আমি তা জানি।

কিশোর বিস্মিত হ'ল। বললে, আপনি কেমন ক'রে জানলেন?

সে কথা পরে হবে। কিন্তু তার এতটা স্পর্ধা হ'ল কেমন ক'রে?

বিভূতি তাঁর ছেলেবেলাকার মাস্টার ছিল। সেই সময় কি সব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়। মিসেস রায়ের লেখা সেই সময়ের চিঠি সব তার কাছে আছে। এই চিঠিগুলিই তার স্পর্ধার কারণ। সে আমাকে বলেছে যে, ভবিষ্যতে সে মিসেস রায়কে 'নন্দিনী' প্রকাশে বাধ্য করবে।

ভয় দেখিয়ে?

অনেকটা তাই। যাকে বলে 'ব্ল্যাক-মেলিং'।

কিন্তু চিঠিগুলো তো জাল নয়?

না। মিসেস রায় বিশ্বাস করেন যে, এই ধরনের চিঠি এখনও তার কাছে আছে।

তা হ'লে এই সব ব্যাপারে আমাকে টানছ কেন? তুমিই বা যাচ্ছ কেন?

ঢোক গিলে বললে, তবে শুনুন স্যার। ওগুলোকে ঠিক চিঠি বলা চলে না। চিঠির আকারে লিখিত কবিতা, প্রত্যেকটিতে তারিখ দেওয়া। কি ভেবে এবং কোন্ খেয়ালে লিখেছিলেন, আজ তিনি তা ধারণা করতে পারেন না। সবগুলি একসঙ্গে বাঁধানো, আসলে কবিতার খাতা।

তবে এত ভয় কিসের?

কবিতাগুলো ইয়ের কবিতা…অথচ চিঠির কায়দায় লেখা… বুঝেছেন স্যার!

বুঝেছি। বুঝেছি ব'লেই গোড়াতে বলেছি, আমি ওসবে নেই। বুঝেছ?

আর একটু শুনুন স্যার। মিসেস রায়ের কাছে তাঁর বাবার পুরনো ডায়েরি আছে। চিঠিগুলো হস্তগত হ'লে তিনি দেখিয়ে দিতে পারবেন যে, সেই সময়ে তাঁর বয়স ছিল বারো কি তেরো। বাল্যরচনার দ্বারা বর্ধিষ্ণু কবির বিচার করা চলে না, নয় কি স্যার?

বাল্যপ্রেমও তাই। অসার্থক বাল্যরচনা ক্ষতিকর নয় মোটেই, বরং নির্দোষ খেলার মতই মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু অসার্থক বাল্যপ্রেম সমাজ ও নীতির দিক থেকে বিপজ্জনক।

অসার্থক বাল্যপ্রেম?

হ্যাঁ, যে প্রেম বিবাহের দ্বারা সার্থক হয়ে ওঠে না। অবশ্য, সব ক্ষেত্রে বিবাহের দ্বারাই যে নীতি রক্ষিত হয়, সে কথা বলা চলে না, তবু তো মুখরক্ষা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা সাধারণ মানুষ বহুর পথ মেনে চলব। বহুর মধ্যে যদি মত-মন্বন্তর ঘটে, আমরাও না-হয় ধর্মান্তর গ্রহণ করব। নীতি মানে নির্দিষ্ট গতি।

যদি বিপ্লবের প্রয়োজন হয়?

বিবাহও একদিন বিপ্লবরূপেই এসেছিল। যুগে যুগে তা দোষ সংগ্রহ করেছে এইজন্যেই যে, সংসারে কিছুই নিখুঁত নয়। তাই ব'লে আমি মনে করি না যে ওটা একেবারেই বর্জনীয়। একটি ছিদ্রপূর্ণ কলসীর পরিবর্তে অন্য একটি গ্রহণ করার নাম বিপ্লব নয়। যিনি উচ্চতর আদর্শ জানতে এবং আনতে পারেন, তিনিই সার্থক বিপ্লবী।…কিন্তু মিসেস রায় তো এত কথা ভাবে নি। তার তখনকার মনোভাব যদি নির্দোষই ছিল, এখন এত শঙ্কিত হচ্ছে কেন?

শেষ জীবন পর্যন্ত বাল্যরচনার স্মৃতি থেকে যায়।

বাল্যপ্রেমেরও।

ঠিক তাই। সেইজন্য অনেক পরে নিজের কাছে তার দোষ ধরা পড়ে। গোড়ার দিকে বিভূতিবাবুর খাতাখানা নিজের বাক্সে রাখতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি। যদিও শেষে নষ্ট ক'রে ফেলেন।

ওগুলোও কি কবিতা?

একই ধাঁচের।

মিসেস রায়ের পক্ষে ওই বয়সে এই ধরনের কবিতা লিখবার কারণ? না বুঝেই লিখেছিল?

খুব সম্ভব। হতে পারে বাল-সুলভ অনুকরণ-প্রিয়তা। বাল্যপ্রেমের মতই।

সে তার স্বামীকে সব কথা জানাচ্ছে না কেন?

ডক্টর রায় এখানে নেই। মিসেস রায় আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করেন, সব কথা খুলে বলেছেন। যতদিন না ডক্টর রায় এখানে ফিরে আসেন, ততদিন ওই লোকটা যাতে তাঁদের বাড়িতে না আসতে পারে, এই সাহায্যটুকু তিনি আমার কাছে চান।

পিস্তল নিয়ে কি হবে?

ভয় দেখিয়ে খাতাখানা আদায় করব!

আমার কাছে পিস্তল নেই! থাকলেও তা দেব না।

তা হ'লে দেখছি, যে কাজটা ভয় দেখিয়ে করা যেত, জোর ক'রে তা করতে হবে।

তোমার যা খুশি তাই করতে পার। আগেই বলেছি, এ-সবের মধ্যে আমি থাকতে চাই না।

তবে থাক্, এ কাজ আমি একাই পারব। শুধু একটা বিষয়ে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।

কি ?

সন্ধ্যের পর, ধরুন আটটা পর্যন্ত, মিসেস রায়ের ওখানে আপনাকে খানিক বসতে হবে। বড্ড ভয় পেয়েছেন তিনি।

অর্থাৎ তোমরা মারামারি করবে, আর আমি হব তার সাহায্যকারী। আমি কিচ্ছু পারব না। তুমি যেতে পার।

অপ্রসন্নভাবে সে উঠে চ'লে গেল। একটু পরে উঠে, কাপড়চোপড় ছেড়ে, বাক্স থেকে পিস্তলটা বের ক'রে টোটা পুরলাম। সেটা পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়ি।

অতসীর সঙ্গে দেখা হতেই সে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে থাকে।

ছেলেমানুষই তো, তোমার কাছে চিরকালই সে ছেলেমানুষ। ওরাই তো ভুল করবে। আমরা যদি ক্ষমা না করি, হায়, ওদের নরকে ঠেলে দেওয়া কত সহজ। প্রভাতকে ও সব কথা খুলে বলুক। তারপর যা-হয় হবে। বাকি দায়িত্ব আমার। মনে মনে ওকে আমি কন্যারূপে গ্রহণ করি।

সস্নেহে তুলে ধ'রে সান্ত্বনা দিলাম, তোমার কিছু ভয় নেই। আমরা সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি তোমার স্বামীকে সব কথা বলতে প্রস্তুত ?

সাশ্রুনয়নে জানালে যে, সে সেই অপেক্ষাতেই বেঁচে আছে। অগ্নি-পরীক্ষায় কৃতকার্য না হ'লে তাকে সেই আগুনেই পুড়ে মরতে হবে।—এই ব'লে বাক্স খুলে বাঁধানো খাতাখানা বের ক'রে আমার হাতে দিয়ে দিলে। নোটবুকের সাইজের খাতাখানা, কিছু না দেখেই আমার কোটের পকেটে রাখলাম।

কিশোর এসে বললে, তাকে বিশেষ কিছু করতে হয় নি। বিভূতিবাবু

বাড়িতে ছিলেন না। চাকরের চোখে ধূলো দিয়ে তাঁর বাক্স থেকে সে খাতাখানা চুরি করেছে। কিশোর ডক্টর রায়ের ল্যাবরেটরি-ঘরে আশ্রয় নিলে। স্থির হ'ল যে, ডক্টর রায় ফিরে না আসা পর্যন্ত সেইখানেই থাকবে।

ফিরে আসবার সময় পিস্তলটা তার হাতে দিয়ে বললাম, এটা বরং তোমার কাছেই থাক্। কিন্তু গুরুতর প্রয়োজন ভিন্ন ব্যবহার করবে না। এই বিষয়ে বার বার সাবধান ক'রে চিন্তিতমনে বাসায় ফিরি।

২২

কয়েক দিন ওদিকে যাই নি। কিশোর এসে নিয়মিত অতসীর খবর দিয়ে যায়। আজ সকালে কিশোর এসে জানালে যে, প্রভাত ফিরে এসেছে এবং তার লেখা একখানা চিঠি আমাকে দিলে। প্রভাত লিখছে যে তার মনো-বিকলনযন্ত্র সম্পূর্ণ হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় 'নন্দিনী' কার্যালয়ে তার পরীক্ষা চলবে। এই পরীক্ষায় দু-চারজন আত্মীয় বন্ধু ছাড়া আর কেউ উপস্থিত থাকবে না। আমার উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়। পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে, অতসীর খাতাখানা যেন সঙ্গে আনি।

যন্ত্রে ধরা পড়েছে যে, গাছেরও জীবন আছে। মানুষের মনও যন্ত্রে ধরা পড়বে। বিজ্ঞানের নূতন দ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে, মনোরাজ্যে আসবে বিপ্লব। এত বড় একটা আবিষ্কার—এমন একটা আনন্দ-সংবাদ নিজে এসে জানিয়ে গেল না। তার কারণ বোধ হয় খাতাখানাই। সব কথা তা হ'লে তাকে জানানো হয়েছে। কিন্তু এই যন্ত্রপরীক্ষার ব্যাপারের সঙ্গে খাতাটার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে, বুঝতে পারলাম না। এর সঙ্গে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ যোগ করা কেন?

সন্ধ্যাবেলায় 'নন্দিনী'তে পৌঁছে দেখি, একটি ক্ষুদ্র কক্ষ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। উঁচু টেবিলের উপর যন্ত্রটা রাখা হয়েছে। সেই ঘরে উপস্থিত ছিল অতসী, অনু, কিশোর, পূর্ণিমা, বিভূতি। ডক্টর রায় তো ছিলই।

আমাকে দেখে ডক্টর রায় সোৎসাহে বললে, এই যে, আপনি এসেছেন। আপনার অপেক্ষাতেই ব'সে ছিলাম। আসুন, আপনিই আসুন, আপনার আশীর্বাদ নিয়েই আমার প্রাথমিক পরীক্ষা শুরু হোক।

আমি যন্ত্রের কাছে উঠে যেতে, আমার মুখে একটা প্রকাণ্ড মুখোশ পরিয়ে দিলে। স্টেথোস্কোপের মত দেখতে একটা মস্ত মোটা রবারের নল যন্ত্র-লগ্ন হয়ে টেবিলের ওপর প'ড়ে ছিল। সেই নলের মুখটা আমার বুকে লাগিয়ে বললে, এইবার চোখের সামনে যে প্রশ্নটা লেখা আছে দেখতে পাবেন, সমনোযোগে প'ড়ে দেখবেন। আপনাকে কোনও জবাব দিতে হবে না, কিছুই করতে হবে না। আপনার মনের কথা আমার যন্ত্রে কাচের উপর ফুটে উঠবে।···রেডি ?

ইয়েস্।

ওয়ান, টু, থ্রি—বলতেই মুখোশটার ভিতর বৈদ্যুতিক আলো জ্ব'লে উঠল। চোখের সামনে জলন্ত অক্ষরে ভেসে উঠল একটিমাত্র প্রশ্ন—"তোমার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় কে ?" অক্ষরগুলোর চোখ-ঝল্সানো দীপ্তির জন্যই হোক, কিংবা যে পিতলের প্লেটটার উপর খালি পায়ে আমাকে দাঁড় করানো হয়েছিল তাতে বিদ্যুৎ-পরিচালনা করেছিল কি না বলতে পারি না—এক মুহূর্তে আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেলি। কিন্তু সে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য।

পড়া হয়েছে ?

হ্যাঁ।

মুখোশ খুলে দিয়ে বললে, আপনি যেতে পারেন। শুধু তার প্রশ্নের বিষয় আপাতত আর কাউকে জানতে দিতে নিষেধ করলে। আমি গিয়ে বসলাম। একই প্রক্রিয়ায় সকলেই এই পরীক্ষার বিষয়ীভূত হ'ল। শুধু প্রত্যেকের বেলায় যন্ত্রের কাচটা পাল্‌টে দিলে। আমাদের বসবার বন্দোবস্ত এমনভাবে করা হয়েছিল যে, ডক্টর রায়ের অজ্ঞাতসারে প্রশ্নের কথা কেউ কাউকে জানাতে পারত না।

অবশেষে ডক্টর রায় বললে, কাচের প্লেটগুলো নিয়ে আমার একটু কাজ আছে। আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না। আধ ঘণ্টা পরে দেখতে পাবেন, আমার প্রশ্নের উত্তর কাচের গায়ে আঁকা রয়েছে। একই প্রশ্ন আমি সকলকে করেছি, অতএব প্রশ্নটা কি আর কারও তা জানতে বাকি রইল না।

কাচের প্লেটগুলো হাতে ক'রে অন্য ঘরে চ'লে গেল। সকলেই নীরবে ব'সে রইলাম, প্রশ্নটা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও আলোচনা হ'ল না। অতসীর মুখখানা কাগজের মতো সাদা—যেন রক্তহীন। কিশোর পূর্ণিমা লজ্জায় চোখ তুলে চাইতে পারছে না। অনু এবং বিভূতির মুখে ভাবান্তর লক্ষিত হ'ল না—হয়তো একটু কৌতূহল ছিল। একটা কথা ভেবে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

প্যারিসের সেই মেয়েটি! যদি তারই ছবি ফুটে ওঠে আমার প্লেটটায়! লজ্জার বিষয় হবে সন্দেহ নেই। মনে মনে প্রভাতের উপর বিরক্ত হয়ে উঠলাম। এইভাবে আমাকে ধ'রে জাঁতাকলে ফেলা তার উচিত হয় নি। আমিও তো রাজী না হ'লেই পারতাম। কিন্তু কখন এতটা তলিয়ে বুঝি নি।

পুরো আধ ঘণ্টা যেতে না যেতে কাচের প্লেটগুলো হাতে ক'রে

ডক্টর রায় আমাদের ঘরে ফিরে এল। তার মুখে-চোখে আনন্দ ও কৌতুকের দীপ্তি। আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললে, আপনার প্লেটে উঠেছে একটি এক বছর কি দেড় বছরের শিশুমূর্তি।

প্লেটটা হাতে নিয়ে দেখি, তাতে ফুটে উঠেছে একটি ফ্রক-পরা ছোট্ট মেয়ের ছবি। আমার স্মৃতিসমুদ্র আলোড়িত ক'রে ভেসে উঠল এক হতভাগ্য মাতৃহীন পিতৃপরিত্যক্ত বালিকা!

প্রভাত বললে, তার পর অনু-বউদি। তোমার প্লেটটায় উঠেছে সুরেনদার ফোটো।

অনু ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে ফোটোটার নীচে মাথা ঠেকালে। বুঝলাম, সুরেন তার স্বর্গীয় স্বামীর নাম। তার সারাজীবনের ধ্যান—পূর্ণিমাও যা ভাঙতে পারে নি।

তারপর কিশোর-পূর্ণিমা। এরা দেখছি পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেছে।—এই ব'লে সকৌতুকে অনুর দৃষ্টিতে দৃষ্টি মেলালে।

কিশোর ও পূর্ণিমা দুজনে দুই দরজা দিয়ে দৌড়ে পালায়। অনু চমকে ওঠে।

অন্য একটা প্লেট তুলে নিয়ে বিভূতিবাবুকে লক্ষ্য ক'রে বললে, আপনার একটা প্রিয় পোষা কুকুর আছে?

বিভূতি বললে, ছিল। এক বৎসর হ'ল মারা গেছে। ধবধবে সাদা কুকুর—নাম ছিল গোরা।

গায়ের রঙ এতে ওঠে না। দেখুন এসে।

বিভূতি ততক্ষণে ডক্টর রায়ের কাছে উঠে গেছে। উল্লসিতভাবে ব'লে উঠল, অবিকল সেই। প্লেটটা আমায় দেবেন?

স্বচ্ছন্দে। একখানা দু আনা দামের কাচ বই তো নয়!

বাকি শুধু অতসী। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন নিজেকে

আর ধ'রে রাখতে পারছে না। ডেকে বললে, অতসী, এদিকে এস। তোমার প্লেটটা তুমি নিজেই দেখে যাও। ধীরে ধীরে গিয়ে প্লেটটা হাতে তুলে নিতেই অতসীর হাত দুটো থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। চার-কোণা পাতলা কাচ হাত থেকে খ'সে মেঝের ওপর প'ড়ে ঝনঝন শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। তার স্বামীকে প্রণাম করতে গিয়ে মূর্ছিত অতসী তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু সেটা মূর্ছা ছিল না, ক্ষণিক ভাবাবেগ মাত্র। তাকে দু হাতে তুলে ডক্টর রায় একটা ঈজি-চেয়ারে বসিয়ে দিলে। অতসী একটু সামলে নিয়ে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে, সব কথা আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম। আমার বুঝতে বাকি ছিল না, 'নন্দিনী'-প্রকাশে তোমার যে অশেষ উৎসাহ হঠাৎ কেন নিবে গেল, দিন দিন কেন তুমি নির্জীব এবং অসুস্থ হয়ে পড়ছিলে—তোমার অসুখটা ছিল মানসিক। আমি আশা করেছিলাম, আমাকেই তুমি তোমার মনের কথা খুলে বলবে। অন্তত অনু-বউদিকে বলা উচিত ছিল। আমি যদি না জানতে পারতাম, মানসিক অশান্তির ফলে এবং অন্যান্য কারণে তোমার প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটতে পারত।···না, না, তোমাকে অমন ক'রে আমার দিকে চাইতে হবে না। ক্ষমা? সে আমি অনেক আগেই করেছি, নিজেরই অজ্ঞাতসারে, কারণ তোমার অপরাধই আমি খুঁজে পাই নি। তুমি ভারি বোকা, এই সব ছেলেখেলা নিয়ে মাথা ঘামাও।

আমার কাছে এসে খাতাখানা চেয়ে নিলে। খাতা দেখে বিভূতি চমকে উঠল। তার মুখ বিবর্ণ—বেশ বোঝা গেল, তার ভিতরের কাপুরুষটা ভয়ে কাঁপছে।

খাতাটার মলাট তুলে প্রথম পাতা থেকে উচ্চকণ্ঠে প'ড়ে গেল—

হে মোর প্রেমের গুরু

তোমা হতে হ'ল মোর প্রেম-পাঠ শুরু!

আকাশে চাঁদের আলো

হৃদয়ে বেসেছি ভালো,

সেই প্রেমে হিয়া মোর কাঁপে দুরু দুরু।

শেষের লাইনটা শুনে আমার মনে হেডমাস্টারের শোকোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হ'ল—

তোমার'অভাবে গুরু

হিয়া কাঁপে দুরু দুরু!

অতসী লজ্জিত হয়ে উঠছিল। প্রভাতরবি তবু ছাড়ে না—

টলটল নিরমল দীঘি-কালোজল,

তার বুকে জ্যোৎস্না করে ঝলমল!

ওই কালো, ওই আলো,

ওরা কি বেসেছে ভালো?

বনে বনে সুরভিত প্রেমের অগুরু—

তোমা হতে হ'ল মোর প্রেম-পাঠ শুরু!

এই পর্যন্ত প'ড়ে প্রভাতরবি মন্তব্য করলে, তেরো বৎসর বয়সে যে বালিকার মনে এমন উচ্চশ্রেণীর প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হয়, তার ভাবী স্বামীর পত্নী-সৌভাগ্য এ সংসারে এক বিরল বস্তু।—লেখক-দাদু কি বলেন? জিজ্ঞাসাটুকু আমাকে লক্ষ্য ক'রে।

বিভূতিবাবুকে লক্ষ্য ক'রে বললে, আপনার বিরুদ্ধে আইন ছিল, সাক্ষী ছিল, টাকার জোরও ছিল কিছু। গায়ের জোরও কম ছিল না। আমার স্ত্রীর মত আমি সম্মান-ভীরু নই, তবে আমার রুচি হ'ল না। আপনি যেতে পারেন।

প্রভাত-রবির হাত ধ'রে কাতরভাবে বিভূতি বললে, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। না পারেন শাস্তি দিন।

শান্তকণ্ঠে প্রভাত বললে, না, কোনও যোগ্যতাই আপনার নেই। তবে অন্য একটা বিষয়ে আপনার যোগ্যতা আমি লক্ষ্য করেছি। কলকাতার বাইরে প্রথম সংখ্যাতেই একখানা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য-পত্রিকা গ'ড়ে তোলা কৃতিত্বের কথা নয়। আমার ইচ্ছা, কাল থেকেই আপনি নিজের কাজে লেগে যান। আমরা সকলে সাহায্য করলে 'নন্দিনী'র ভবিষ্যৎসাফল্য সুনিশ্চিত।

এ প্রস্তাবে বিভূতি সম্মত হ'ল না। বললে, আপনারা আমাকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু আমি এখানে থাকতে চাই না। সে নত-মস্তকে বেরিয়ে গেল।

আপনারা বসুন।—ব'লে ডক্টর রায়ও ঘর থেকে চ'লে গেল। বিভূতির অনুসরণে নয়—অন্য দরজা দিয়ে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। যেন যাদুকর তার যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে দিয়েছে।

এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে খুঁজে কিশোর-পূর্ণিমাকে গ্রেপ্তার ক'রে এনেছে। দু হাতে দুজনকে টানতে টানতে নিজের টেবিলের দুই পাশে দাঁড় করিয়ে দিলে। দড়ি ছিঁড়ে বকনা বাছুর যেমন লাফিয়ে পালায়, হাত-ছাড়া পেয়ে পূর্ণিমাও তাই করলে। একেবারে রাস্তায়। কিশোর হেসে ফেললে। সস্নেহে রায় বললে, এর ফল কি জান? অনেক সময় দুঃখ পেতে হয়। নানা কারণে তোমাদের মিলতে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। হয়তো তুমি স্বাধীন নও, পূর্ণিমা তো নয়ই।

ঠিক যে পরাধীন তাও বলা যায় না। আমি নিজের কথা বলছি।

তোমার বাড়ি কোথা?—প্রভাতের জিজ্ঞাসা।

আপাতত ডক্টর রায়ের বাড়িতে এবং অতসীদির চরণাশ্রয়ে।

তোমার বাপ-মা আছেন ?

আছেন। বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, আমরা পাঁচ ভাইবোন।

তবে এ রকম উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছ কেন ?

তাঁরা কলেজের খাঁচায় পুরতে চেয়েছিলেন, অগত্যা আমি উড়ে পালিয়েছি।

তারপর এখানে এসে ধরা দিলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। এই শহরেই ছিলাম। 'নন্দিনী'র এই নষ্টনীড় তখন নতুন গ'ড়ে উঠছিল। খুব ভাল লাগল, তাই জুটে গেলাম।

চালাতে পারবে ?

বলতে পারি না। ছবি, কবিতা, গানের স্বরলিপি দিতে পারি।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভার আমার। ভাষাটা তোমরা সংশোধন ক'রে নিও। মনস্তত্ত্বের গল্প এবং প্রবন্ধ লেখবার লোক ঘরেই আছেন। বাকি সংগ্রহ আমিই করব।···পূর্ণিমাকে সংসার-সাথী ক'রে নিতে রাজী আছ ?

অন্তত ইহজন্মের জন্য। ওর যতকাল খুশি। পরজন্মের কথা পর-জন্মে বিবেচনা করা যাবে।

অনুর দিকে চেয়ে প্রভাত শুধোয়, অনু-বউদির মত কি ?

অনু সানন্দে সম্মতি দিলে।

সংসারে এমন কোন্ বস্তু আছে, যা যতই টানা যায় ততই বাড়ে? আপনারা বলবেন রবার। আমি বলব, উপন্যাস। রবারও বেশি টানলে ছিঁড়ে যায়।

এ যেন ঠিক অসীম শূন্যে ঘুড়ি ওড়ানো। সারাদিন আকাশপানে চেয়ে চেয়ে লাটাই ঘুরিয়ে আর আগুপাছু হেঁটে হস্তপদ ক্লান্ত—এবার উল্টো পাকে সুতো গুটোতে হবে। নইলে, পাঠকের সমালোচনা-ঘুড়ি আকাশে উড়বে, তাঁর সুতোর ধারালো মাঞ্জা, আমার ঘুড়ি হবে ভাগ্-কাটো।

পুতুলের বিয়ে মনে আছে নিশ্চয়—এতবড় একটা ঘটনা ভোলবার নয়। কিশোর-পূর্ণিমার বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার উপর বর্তে, উপন্যাসের আর্ট এমন কথা বলে না। কিন্তু এমনি আমার অদৃষ্ট, সব-কিছুতেই জড়িয়ে পড়া! দেখতে পাবেন,আর্ট বজায় রাখতে গেলে আমার নিজের 'পার্ট' অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তা ছাড়া, আমি তো আর উপন্যাস লিখছি না ঠিক, মালমসলা সংগ্রহ করছি মাত্র।

প্রস্তাবিত বিবাহ দুই দিক থেকে অসবর্ণ। প্রভাতের মুখে শুনলাম, অনুর বংশপরিচয় সে নিজেই জানে না। শুধু এইটুকু জানা আছে যে, সে বাঙালীর মেয়ে—পশ্চিমদেশে লালিত-পালিত। তার কথায় বৈদেশিক টান চতুর শ্রোতার কাছে আজও ধরা পড়ে। তার স্বামী ছিল বাঙালী কায়স্থ। এক দিক থেকে এই বিবাহকে বর্ণহীনও বলা যেতে পারে। অতএব পিতৃপরিচয়ে পূর্ণিমা কায়স্থ-কন্যা। কিশোর বৈদ্যবংশজাত। ডক্টর রায় বললে, কিশোরের বাপ-মাকে জানানো উচিত। কিশোর বললে, অনর্থক অপ্রিয় ব্যাপারের সৃষ্টি করা হবে।

এই বিবাহে সম্মতি তাঁরা কিছুতেই দেবেন না এবং সে নিজে কিছুতেই তার মত পরিবর্তন করবে না। বলেছিল, সৃষ্টি যদি রসাতলে যায় আর এ পক্ষের যদি মত না বদলায়, পূর্ণিমাকে বিয়ে সে করবেই।

অনুর পক্ষে মতবদলের হেতু ছিল না; এই রকম অবস্থায় পূর্ণিমার জন্য যোগ্যতর পাত্র মেলা অত্যন্ত কঠিন।

আনুষ্ঠানিক বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেল। আইন-ঘটিত কাজ পরে হবে। নিমন্ত্রণ-পত্র এবং বিয়ের পদ্য ছাপা হ'ল। বিয়ের পদ্য আমিই লিখেছিলাম।

এই প্রকারের ক্ষুদ্র শহরে এবং এই ধরনের অসামাজিক বিবাহে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা খুব বেশি হবার কথা নয়। ডক্টর রায়, মিসেস রায় এবং অনুর সঙ্গে সঙ্গীত-শিক্ষা সম্পর্কে পরিচিত জন কয়েক ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা, ছেলেমেয়ে। এই সজীব দুটি পুতুলের বিয়েতে প্রভাত সেজেছিল কনেকর্তা, 'বরকর্তা আমি। স্বীকার করি, এই নিয়োগের দ্বারা আমাকে প্রচুর পরিমাণে সম্মানিত করা হয়েছে। বিশেষ কিছু দায়িত্ব নেই—বরকর্তাদের থাকেও না।'

অতিথিদের সঙ্গে ব'সে আলাপ করছি, অনুর কাছে গিয়ে প্রভাত যেন কি বললে। যার ফলে অনু এসে আমাকে ডাকলে, আপনি একটু এদিকে আসুন।

আমি তার পিছু পিছু উঠে আসি। পাশের একটা নিরিবিলি ঘরে বসিয়ে বললে, বিয়ে শেষ হয়ে খাওয়াদাওয়া হতে অনেক দেরী। আর আপনি তো সেসব কিছু খাবেন না। একটু বসুন, আপনার জন্যে কিছু ফল মিষ্টি দুধ নিয়ে আসি।

আমি যোগ দিলাম, তার সঙ্গে একটু চা। হাসতে হাসতে সে চ'লে গেল।

যে সব ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন, আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদায় সবাই তাঁরা অনুর বহু উর্ধ্বে। কিন্তু তাঁদের আন্তরিক আনন্দ ও আগ্রহ দেখে বোঝা গেল, তাঁরা এই নিরাশ্রয়া বিধবাটিকে কত বেশি স্নেহের চক্ষে দেখেন। একটু দেরিতে হ'লেও, অনুর অনুচ্ছল আন্তরিকতা সকলকেই আকর্ষণ করে, বলা বাহুল্য, আমাকেও করেছিল।

ঘরখানি ছোট, আসবাব-পত্রও কম, কিন্তু যা ছিল সব রুচিসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমাকে বসিয়েছিল একটা সোফার ওপর—ইচ্ছা করলে শুতেও পারতাম। একটা অল্পদামী ক্লক টিক্ টিক্ করতে করতে টং টং ক'রে উঠল—চেয়ে দেখি, রাত্রি তখন নটা। ক্লকটার ঠিক নীচে দেওয়ালে টাঙানো পাশাপাশি দুখানি ফোটোর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল—বাঁধানো ফোটো। ফোটো দুটিতে টাটকা ফুলের মালা ঝোলানো। তার মধ্যে একখানা ছবি দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার চিন্তাশক্তি আরও কিছু অগ্রসর হতেই আমি সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে দ্রুত অগ্রসর হয়ে ফোটোর নীচে দাঁড়াই। আমার বুকের ভিতর কে যেন জোরে জোরে হাতুড়ি পিটতে লাগল।

খাবার হাতে অনু ঘরে ঢুকতেই অতিকষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডেকে ফোটো দুখানির পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। যুক্তকরে ফোটোর উদ্দেশে প্রণাম ক'রে অনু বললে, একখানি তার স্বামীর, অন্যখানি তার বাপ-মায়ের।

বাপ-মায়ের। অনুরই বাপ-মায়ের ছবি! এ যে আমার আর অমলার যৌবনের ফোটো! জোরে তাকে বুকের মাঝে জাপটে ধরি, খাবারগুলো চারিদিকে ছিটকে পড়ে। ভাগ্যক্রমে আমার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হবার আগেই বুদ্ধিমতী অনু আমাকে ধ'রে ফেলেছিল।

চেতনা ফিরে এলে দেখলাম, সেই সোফাটায় শুয়ে আছি। আমার বালিশ এবং চুল দাড়ি গোঁফ জলসিক্ত। শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাত, অতসী, অনু, কিশোর, পূর্ণিমা এবং সেই ডাক্তারবাবু—অতসীর অসুখের সময় যাঁকে আমি ডক্টর রায়ের ওখানে প্রথম দেখেছিলাম। ধীরে ধীরে উঠে বসি—ডাক্তারের বাধাসত্ত্বেও। অনু আমার বালিশ পালটে দিলে, অতসী দিলে মাথা মুছিয়ে।

ডাক্তারকে লক্ষ্য ক'রে বললাম, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। অপ্রত্যাশিত আনন্দে একটুখানি মানসিক আঘাত ভিন্ন এ আর কিছুই নয়। তবে শুনুন।

সংক্ষেপে সব কথা খুলে বলি। আরও বলি ওই দুখানা ফোটোর পিছনে আমার নাম দস্তখত আছে, তারিখও আছে—যে তারিখে আমি দেশ ত্যাগ করি। দূর বিদেশে কি জানি কখন কি হয় ভেবে ফোটো দুখানি রূপলালকে খুব সাবধানে রাখতে বলেছিলাম, আর বলেছিলাম, খুকীর জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ফোটোর ছবির সঙ্গে যেন তার পরিচয় করিয়ে দেয়।

ফোটো দুটোর ফ্রেম খুলে ফেলে ডক্টর রায় দেখলে, তারিখ-সম্বলিত ইংরেজী স্বাক্ষর আজও সমুজ্জ্বল। আমার সংশোধিত দাম্পত্য জীবনের একান্ত নীরব সাক্ষী, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবি তুলিয়েছিলাম। খুকী তখন পৃথিবীতে এলেও পৃথিবীর মাটিতে পা ফেলে নি। ওকে আমরা 'খুকী' ব'লেই ডাকতাম, অদ্বিতীয় ব'লে নামকরণের প্রয়োজন হয় নি।

অনু আমার পায়ের কাছে প'ড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। সত্যই তার অভিমানের কারণ ছিল। পূর্ণিমা এসে গলা জড়িয়ে ধ'রে ছলছল চোখে বললে, দাদু! ভাবাবেগে কিশোর আমার সাদা দাড়িতে চুমু দিলে।

রাত্রি বারোটায় দ্বিতীয় লগ্নে শুভবিবাহ নিষ্পন্ন হ'ল। অনুষ্ঠান হিন্দুমতেই হ'ল, পৌরোহিত্য করলেন কলেজের এক প্রফেসর। আপ্যায়িত অভ্যাগতের দল আমার ঘরে ঢুকে আমার স্বাস্থ্যবিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। আমার আর কিছুই হয় নি—দেহে না হোক, মনে তখন শতহস্তীর বল।

২৪

আমার উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ আপাতত শেষ হ'ল, যদিও গল্পের এখনও অনেক বাকি। কে জানত, ঘটনাচক্রে আমিই আমার উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ উপকরণ হয়ে পড়ব!

অনুর হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস অপর একটি উপন্যাসের উৎকৃষ্ট উপকরণ। রূপলালের মৃত্যুর পর কেমন ক'রে কার আশ্রয়ে সে বড় হ'ল, কি ভাবে এক সুশ্রী সুধী বাঙালী যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল, কোন্ সূত্রে বিলাতে প্রভাতরবির সঙ্গে তার স্বামীর বন্ধুত্ব হ'ল এবং বিলাতেই তার মৃত্যু ঘটল এবং কেমন ক'রে ভাসতে ভাসতে অনু-পূর্ণিমা অবশেষে এসে ডক্টর রায়ের উদার বন্দরে নোঙর ফেললে—এসব বৃত্তান্ত এখন আমি বলব না। আজ-কালকার আর্টের বাজারে 'ফাউ' সিস্টেম উঠে গেছে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় ডক্টর রায়কে বললাম, এইবার তুমি তোমার মনোবিকলনযন্ত্রে ফের আমাকে পুরে দেখতে পার, কার ছবি ফুটে ওঠে! তোমার যন্ত্রের কাচের এক বৎসরের শিশুটি অনু ভিন্ন আর কেউ নয়। এখানে ঠিক অনুর ফোটো ফুটে উঠবে।

প্রভাত হেসে বললে, কাজ নেই, অতসী হিংসে করবে। তা ছাড়া

যন্ত্রটা আমি ভেঙে দিয়েছি। 'হাতের সুখে গড়লাম, পায়ের সুখে ভাঙলাম'—ছড়াটা বালির ঘর তৈরি ক'রে সন্ধ্যেবেলায় তা ভাঙতে ভাঙতে ঘরে ফিরবার আগে ছেলেমেয়েরা আবৃত্তি ক'রে থাকে।

ভেঙে দিয়েছ? অবাক করলে তুমি! ভাঙলে কেন?

থিওরিতে ভুল ছিল। কাঠ-লোহার তৈরী প্রাণহীন যন্ত্রের সাধ্য কি, নরনারীর পবিত্র ভালবাসা ধ'রে রাখবে? মাত্র ক্ষণিক মনোভাব ওতে ধরা পড়ত। মেঘের ছবি আঁকবে কে? আঁকতে আঁকতে রূপ পালটে যায়। কতজনই তো আসছে, পর পর এসে আমাদের অন্তর-দ্বারে করাঘাত ক'রে বলছে, মে আই কাম ইন?—কজনকে আমরা জায়গা দিতে পারি? তারা শুধু দুয়ারের কাছে ছায়া ফেলে দূরে চ'লে যায়। সেই অস্থির ছায়াও আবছায়া হয়ে কাঁচের গায়ে ফুটে উঠবে। এর দ্বারা শুধু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে—একেই তো চলতি জগতে তার অন্ত নেই।

কিন্তু অমর প্রেম, যা যুগ-যুগান্তর ধ'রে মানুষের মনে স্থায়িত্ব পেয়েছে?

সাহচর্য-জাত অপরিহার্য ভালবাসা ছাড়া আর কিছুতে আমার আস্থা নেই।

'লোহার বাসর ঘরে' পুতুল দুটো এখনও পাশাপাশি শুয়ে আছে।··· কূটতর্কে প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছা হ'ল না। আমার মন তখন যন্ত্রটার শোকে হাহাকার করছে। এমন একটা আবিষ্কার হতে বঞ্চিত হ'ল বিশ্বের মানুষ! স্বগতোক্তির মত মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, না না, এ ভারি অন্যায়, খুব খারাপ। খামখেয়ালী ছাড়া কিছুই নয়। যন্ত্রটা নষ্ট ক'রে ফেলা উচিত হয় নি।

কেন উচিত হয় নি? ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এমন কোনও যন্ত্র আবিষ্কার করবেন না, যদি তিনি বুঝতে পারেন, তার দ্বারা মানুষের—এমন কি জীবজগতের অকল্যাণ হতে পারে।

আবিষ্কার কখনও দোষী হতে পারে না, মানুষের দোষেই কলুষিত হয়।

বিজ্ঞান আজ দেবগুরু বৃহস্পতির হাত থেকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের হাতে গিয়ে পড়েছে। স্বার্থপর লোভী বৈজ্ঞানিক দৈত্যরাজদের কাছে আত্মবিক্রয় করেছে।

পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্য মানুষের মানসিক পরিবর্তনের আশাই আমরা করব—বিজ্ঞানকে পিছু হটিয়ে নয়।

সেই মানসিক পরিবর্তন আনতে পারেন শুধু সাধু বৈজ্ঞানিক—কল্যাণময় আবিষ্কারের দ্বারা এবং অকল্যাণকর দূষিত বিজ্ঞানকে বর্জন ক'রে। কিন্তু দাদু, আপনি নিশ্চিন্ত হোন, এ রকম কোনও যন্ত্রই আমি তৈরী করি নি। চেষ্টা চলছে হয়তো, কিন্তু আজও কেউ করতে পারে নি। আমার চেষ্টা ও-পথে নয়।

সে কি! তা হ'লে? ছবিগুলো উঠলো কেমন ক'রে?

ঘষা কাচের ওপরে এক আর্টিস্ট এঁকে দিয়েছে—আমার নির্দেশমত।

আমার হারানো মেয়ের ইতিহাস তোমার জানা ছিল না।

খবরের কাগজে আপনার দেওয়া বিজ্ঞাপন প'ড়ে আমার মনে কৌতূহল জাগে। ক্রমে কৌতূহল সন্দেহে পরিণত হয়।

তোমার জানা সম্ভব ছিল না যে, বিজ্ঞাপনটা আমারই। ওতে আমার নাম-ঠিকানা দেওয়া ছিল না।

কলকাতা থেকে যেদিন আমি চিঠি লিখি, দুদিন পরে আর একখানা চিঠি পেয়েছিলেন—কলকাতার কোনও ডিটেকটিভ আপনার মেয়েকে

খুঁজে দেওয়ার ভার নিতে চাইছেন? বিনিময়ে দশ হাজার টাকা পুরস্কার?

হ্যাঁ, পেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে কি? আমার স্বীকৃতি ও অনুরোধ সত্ত্বেও ডিটেকটিভ আমার সঙ্গে দেখা করে নি। চিঠিও লেখে নি আর।

সেই ডিটেকটিভ আমিই।

এত কাণ্ড করবার দরকার ছিল না। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই সন্দেহ মিটত।

যদি না মিটত? শুধু নামের ওপর নির্ভর ক'রে এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলে না। আশা পেয়ে আশা ভঙ্গ হ'লে কি প্রাণে বাঁচতেন? আপনার যৌবনের ফোটোর সঙ্গে এখনকার চেহারার কোনও সাদৃশ্যই খুঁজে পাই নি।

অনু আমার নাম জানত না? তার বাপের নাম নিশ্চয় তার জানা ছিল।

ছিল। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ হবার পর আপনার নাম জানতে সে কোনও চেষ্টাই করে নি। খুব সম্ভব দরকার বোধ করে নি। বয়োবৃদ্ধ পুরুষের সম্বন্ধে মেয়েরা তা করেও না। কিংবা কর্মব্যস্ত অনু-বউদির এদিকটায় খেয়ালই ছিল না। এতে আমার সুবিধাই হয়েছে। অনুসন্ধানের সুবিধা। কি বলেন?

তোমার কোনও কথাই আমি বিশ্বাস করি না। আগে বলেছ, কিছুই তার জানা ছিল না।

বিষম ঠকেছেন, দাদু, বিষম ঠকেছেন। বৈজ্ঞানিকের কাছে গল্প-লেখকের এই গভীর পরাজয়!

তুমিই ঠকেছ। আত্মপরিচয় দিয়ে দশ হাজার টাকা পুরস্কার হারালে।

আমার পুরস্কার অন্যত্র। আশীর্বাদ করুন, আমার বিশ্বকল্যাণকর বিজ্ঞান-সাধনা যেন সফল হয়। উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলে।

তারপর এল অতসীর কথা। 'নন্দিনী'-সম্পাদকরূপে বিভূতির নিয়োগে অতসীর ঘোরতর আপত্তি এই মনস্তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকের মনে সন্দেহ জাগায়। কিশোর-পূর্ণিমা-ঘটিত ব্যাপার আমারও স্থূলদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। এই সব খুঁটিনাটি পৃথক একখানি উপন্যাসের সৃষ্টি করতে পারে। ডিটেকটিভ উপন্যাস। মনস্তত্ত্বে জ্ঞান না থাকলে পাকা ডিটেকটিভ হতে পারে না।

মুহুরীবাবুর আর-ফাটানোর ষড়যন্ত্র নিয়ে কিশোর-পাঠ্য একখানি চমৎকার উপন্যাস লিখতে পারা যায়।

উকিল-পরিবারের খবর রাখি না। তাঁদের বাড়ি থেকে পাকিস্তানী ভাড়াটে উঠে গেছে। ছোট ছেলে মেডিকেল কলেজ থেকে পাস ক'রে এসে সেই বাড়িতে বাস করছে। প্র্যাকটিস বোধ হয় ভালোই জমছে, ডক্টর রায়ের ঋণ পরিশোধিতপ্রায়। উকিল-দম্পতীও মাঝে মাঝে আসেন। নিরীহ হ'লেও একখানা উপন্যাসের বীজ এরই মধ্যে র'য়ে গেছে।

ঘুড়ি উড়োতে উড়োতে ছাদ থেকে প'ড়ে ইঞ্জিন মারা গেছে। আমার প্রিয় ইঞ্জিন! হরেন্দ্রর মহত্ত্বের সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে ইঞ্জিনের মৃত্যুর সূত্র ধ'রে জয়েণ্ট হিন্দু ফ্যামিলির পার্টিশানের দেওয়াল যদি ভাঙতে পারি, উপন্যাস হয় না?

জংলার ঘর ব্যালফুল বেশিদিন করতে পারে নি। সেই গ্রামের কোনও এক চরিত্রহীন ভদ্রবংশীয় যুবকের সঙ্গে কোথায় যেন চ'লে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও সন্ধান মেলে নি। সেই শোকে 'শিশিরবিন্দু' শুকিয়ে গেল। এই ধরনের ঘটনার জন্য মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস-লেখক ওৎ পেতে থাকেন!

অমলার মৃত্যুকালে আমি তার কাছে ছিলাম। আমার, চিরশুষ্ক চক্ষু বেয়ে জল ঝরছিল। হাত তুলে সে মুছিয়ে দিতে চাইলে, হাতখানা নেতিয়ে পড়ল। মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়েও আমার চোখের জল তার কাছে অসহ্য ছিল। আমার চোখ থেকে তার বুকের উপর ঝ'রে পড়ল—একটি নয়, কয়েকটি শিশিরবিন্দু!

এ নিয়ে আমি উপন্যাস লিখতে পারব না। তীব্রতম ব্যক্তিগত ব্যথা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে না।

কএক বৎসর হ'ল এই শহরে এসেছি, যা কিছু পেলাম কুড়িয়ে নিলাম। এই শহরের বড রাস্তাতেই আমাব আনাগোনা, অলিতে-গলিতে আরও অনেক আছে। এই সব এবং সেই সব একত্র ক'রে যদি কোনদিন আপনাদের দুয়ারে গিয়ে হাঁকি—

মে আই কাম্ ইন্?—আমি কি ভিতরে আসতে পাবি?

দয়া ক'রে দরজাটা একটু খুলে দেবেন।

মে আই কাম্ ইন্!—যার মন্ত্রবলে আমার হারিয়ে-যাওয়া ভালবাসার ধন ফিরিয়ে পেলাম।

মে আই কাম্ ইন্।—অল্পতর কথায় মিষ্টতর কবিতা আমার জানা নেই—

মানুষের ঘরে ঢুকতে চায় মানুষ—
মানুষেব মনে ঢুকতে চায় মানুষের মন।

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

—গল্প ও উপন্যাস—

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

স্বাধীনতার স্বাদ ৪৲
সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲
সরীসৃপ ১॥০
মিহি ও মোটা কাহিনী ১॥০

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

নিষ্কণ্টক ১॥০ দুষ্টগ্রহ ২৲
গ্রামের কথা ২৲
ভুলের ফসল ২৲
ললিতের ওকালতি ২৲

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

জলের আল্পনা ১॥০
আলেয়ার আলো ১॥০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

পরাজয় ২৲ নিরঞ্জন ২॥০
উদাসীর মাঠ ২৲

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

স্মৃতির আলো ২৲

বিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত

বৃন্তচ্যুত ১।০
ঘরের ডাক ২৲

সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

বহ্ন্যুৎসব ১॥০ মধুচক্র ১৲
ফাল্গুন-বসন্ত ১॥০ ময়ূরাক্ষী ১॥০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

জনৈকা (মোপাসার অনুবাদ) ২॥০
অসাধারণ (টুর্গেনিভের অনুবাদ) ২৲
রাঙ্গামাটির পথ ৩৲
অস্বীকার ২৲ আঁধি ৩৲
মুস্কিল আসান ২॥০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

লাল মাটি ৪॥০

উপনিবেশ

১ম—২৲, ২য়—২৲, ৩য়—২৲

বনফুল প্রণীত

মন্ত্র-মুগ্ধ ২৲ বাহুল্য ২৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

মিলন-মন্দির ৩৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত

কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

দুই পক্ষ ২॥০

শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

করুণাদেবীর আশ্রম ২৲

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অতীত বস্তু ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

কলঙ্কিনীর খাল ২॥০